MOHAMMAD HOBLOS

এপিটাফ

সাজিদ ইসলাম

BOOKMARK
PUBLICATION

আলি বানাত

আকাশের ওপারে একটা অনিন্দ্য সুন্দর বাড়ি। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এই বাড়িটি কার? সঙ্গী ফেরেশতা জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বাড়িটি সেই ব্যক্তির যে আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে। আমরা খুব করে চাই আল্লাহ যেন আলি বানাতকেও জান্নাতে এরকম একটি বাড়ির মালিকানা দান করেন। সেই জান্নাতে আমাদেরকেও যেন তার প্রতিবেশী করেন। আমীন।

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আফসোস, আমার মৃত্যুর খবর জানানোর জন্য সুটেড বুটেড ডাক্তারের দরকার পড়েছে। ডাক্তার যখন জানাল, কেবল তখনই আমি বিশ্বাস করলাম। অথচ আমার রব সারাটা জীবন ধরে মৃত্যুর বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন, আমি আমার রবের কথায় বিশ্বাস করিনি।"

আলি বানাত (রহ.)

সূচি

মুখবন্ধ

প্রথম বইয়ের ভূমিকায় অনেক আবেগঘন কথাবার্তা লিখব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু সেই ঠিক করে রাখা কথাগুলো জানি না কোন অভিমানে মাথা থেকে কলম পর্যন্ত আসতে চাচ্ছে না। আর জোরাজুরি করতেও ইচ্ছে করছে না।

বইয়ের নাম 'এপিটাফ'—সমাধিলিপি, কবরের উপর স্মৃতিফলকের মতো কিছু। বাইরের দেশগুলোতে খুব কমন হলেও, আমাদের এদিকে বিখ্যাত, পরিচিত, বড় লোক মানুষের কবর ছাড়া এপিটাফ খুব একটা চোখে পড়ে না। জীবনে প্রথমবার এপিটাফ দেখে আমার অন্যরকম এক অনুভূতি হয়েছিল। যেন কবরের মানুষটা তার কবরে একটা এপিটাফ টাঙিয়ে দিয়ে বলতে চাচ্ছে, আমার সিরিয়াল চলে এসেছে, একদিন তোমাদেরও আসবে!

এই বইটার কন্টেন্ট নেওয়া হয়েছে উস্তাদ Mohammad Hoblos এর লেকচার থেকে। তিনি একজন অস্ট্রেলিয়ান দাঈ—মানুষকে ইসলামে দিকে আহবানকারী। মৃত্যু, দুনিয়া, আখিরাত, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তাঁর আলোচনার মূল বিষয়। প্রচন্ডভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। মানুষের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিতে পারেন। জাহিলিয়াত থেকে মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসা, বস্তুবাদি যান্ত্রিক আটপৌরে জীবনে হাঁপিয়ে উঠা এই আমাদেরকে আখিরাতের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, জান্নাতের পথে চলার সীমাহীন শক্তি যোগাতে তাঁর কথাগুলো টনিকের মতো কাজ করে।

বইয়ের কাজ করতে গিয়ে আমার নিজের লেখক সত্তা বারবার ভেতরে ঢুকে পড়তে চেয়েছে, তাকে আমি আটকানোর চেষ্টা করিনি। তাই বইয়ের কন্টেন্ট Mohammad Hoblos এর হলেও, উপস্থাপনা আমার নিজের। কোথাও কোথাও প্রয়োজনে আমি লেখকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছি।

২০১২-২০১৩ সালের দিকের কথা। একদিন ইউটিউবে একটা ভিডিও চোখে পড়ল। বক্তা Mohammad Hoblos. টপিক ছিল আমরা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কে কতটা ভালোবাসি, আদৌ ভালোবাসি কি না! সেদিন তাঁর কথাগুলো এতটাই নাড়া দিয়েছিল, নিজের হালত চিন্তা করে এতটা লজ্জা পেয়েছিলাম, যে লজ্জা আমার এখনো কাটেনি। সেই থেকে এই মানুষটা বারবার শুধু আমাকে লজ্জা দিয়েই চলেছেন।

আমি চাই এই বইটা আপনাদেরকেও লজ্জা পাইয়ে দিক। চোখ ধাঁধানো এই আলোর শহরে উদ্দেশ্যহীন আমাদের এই জীবনগুলোতে সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কিছু ঝাঁকুনি, ধাক্কার দরকার পড়ে। আমি আশা করি এই বইটি সেই ধাক্কা হিসেবে কাজ করবে।

কোনো একদিন আসমানের দিকে তাকিয়ে, বুকভরে বিশ্বাস নিয়ে, কেউ যদি ভাবে —অনেক হয়েছে, এবার পরিবর্তনের পালা, আমার রবের দিকে ফিরে যাওয়ার পালা—তবে এটাই হবে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

বিনীত
সাজিদ ইসলাম
২৮ জানুয়ারি, ২০২০

এপিটাফ

আলি বানাত। অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। এমন একটা জীবন তার ছিল, যা আমাদের অনেকের কাছে স্বপ্নের মতো, মহা আকাঙ্ক্ষিত। সফল ব্যবসা, অর্থ-সম্পদের ছড়াছড়ি, বিলাসিতাময় এক জীবন। ৫০ লক্ষ টাকা দামের হাতের ব্রেসলেট, লক্ষ টাকা দামের সারি সারি লুই ভুটন জুতার কালেকশান, সামান্য চপ্পলের দাম পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার টাকা, ৫ কোটি টাকা দামের ফেরারি স্পাইডার, রেঞ্জ রোভার—কী দুর্দান্ত এক জীবন। উদয়অস্ত আমরা যে মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াই, আলি তা ছুঁতে পেরেছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন...

তিন বছর আগের কথা। তাড়াহুড়ো করে গরম চা-টা শেষ করতে গিয়ে জিভ পুড়ে গেল। আয়নায় চোখে পড়ল জিভের ওপরে মুখের তালুতে ছোট্ট একটা দাগ। কী মনে করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া... চেকআপ করিয়ে নিতে তো দোষ নেই। রিপোর্ট আসলো। ফোর্থ স্টেইজ টেস্টিকুলার ক্যান্সার। সারা শরীরে ছড়িয়ে গেছে। আর কোনো আশা নেই। জানিয়ে দেয়া হলো—খুব বেশি হলে আর সাত মাস!

সাজানো গোছানো স্বপ্নের মতো আলি বানাতের জীবনে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু বদলে গেল। টাকা, ব্যবসা, গাড়ি, বাড়ি, বিলাসী জীবন—সবকিছু অর্থহীন হয়ে গেল।

আর কয়দিন পর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে—জীবনের এই বাস্তবতা আলি বানাতকে এক ভিন্ন মানুষে বদলে দিল। ক্যান্সারের কথা জেনে কেমন অনুভূতি হয়েছিল এমন প্রশ্নের জবাবে চোখ মুছতে মুছতে, ধরা গলায় খুব অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল সে— ‘ক্যান্সার আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য গিফট।’

সে বলেছিল, ‘হঠাৎ করে জীবনের সবকিছু আমার কাছে মূল্যবান হয়ে গেল। আল্লাহর দেওয়া ছোট ছোট নিয়ামতগুলোও আমি দেখতে শুরু করলাম—মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পারার নিয়ামতটুকুও আমার কাছে অনেক কিছু মনে হচ্ছিল।’ ক্যান্সারের মাধ্যমে আলি দুনিয়ার আসল মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একটা ফেরারি স্পাইডারের চেয়ে খালি পায়ে আফ্রিকায়

দৌড়ে বেড়ানো একটি শিশুর জন্য এক জোড়া জুতোর দাম বেশি। ক্যান্সার আলিকে বুঝিয়েছিল এ দুনিয়া আর এর মাঝের সবকিছুই মুছে যাবে। আর কাফনের কাপড়ে কোনো পকেট থাকবে না। যখন কবরের প্রশ্নকারীরা আসবে, দুনিয়া এবং এর সমস্ত সম্পদ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মাটির এ খাঁচা মাটিতেই মিশে যাবে, রয়ে যাবে শুধু তাওহিদ, ঈমান, তাকওয়া আর নেক আমল।

মিলিয়েনেয়ার আলি নিজের ব্যবসা বিক্রি করে দিলেন। নিজের সম্পদ বিলাতে শুরু করলেন। গড়ে তুললেন Muslims Around The World (MATW) নামের চ্যারিটি। টোগোতে মসজিদ আর স্কুল বানালেন। লাখ লাখ টাকা দামের জিনিস মানুষকে দিয়ে দিলেন।

দুনিয়া ছেড়ে যাবার আগে তাই ভাই আলি দুনিয়াকে ছাড়তে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। নশ্বর দুনিয়াকে বিক্রি করে আখিরাত কিনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ক্যান্সার ছিল ভাই আলির জন্য হিদায়াত—আল্লাহর পক্ষ থেকে গিফট।

দুনিয়ার জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা আলি বানাত মারা যান গত বছরের ২৯শে মে রাতে। ডাক্তারদের ঠিক করে দেয়া টাইমফ্রেইমে না, আসমান ও জমিনের অধিপতির নির্ধারিত সময়ে।

দুনিয়াজুড়ে অসংখ্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করা, জীবনের আসল উদ্দেশ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া আলি বানাত জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জন করেছিলেন, যেখান থেকে আমাদের জন্যও শিক্ষণীয় আছে।

১। ক্যান্সার—আলাহর পক্ষ থেকে উপহার।

আলি বানাত নিজেই বলেছে ক্যান্সার তাঁর জীবনে আল্লাহর একটা উপহার হয়ে এসেছিল। ক্যান্সার ধরা পড়ার পরই সে আমূল পাল্টে যায়। আল্লাহর পথে নিজের সবকিছু দান করে দেয়। ঈমান, আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে থাকে। দীর্ঘ তিন বছরের ক্যান্সারের সীমাহীন কষ্ট, ব্যথা-বেদনার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ তার অতীতের গুনাহগুলোও আল্লাহ মাফ করিয়ে নিয়েছেন। কেননা, আমাদের প্রিয় নবিজি (সা.) বলেছেন, মুমিনের পায়ে যদি সামান্য একটা কাঁটাও ফুটে, এর বিনিময়েও আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

> 'যে কোনো মুসলিমের কোনো কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন করে

দেন এবং তার পাপসমূহকে এভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।' (বুখারি ৫৬৪৮, মুসলিম ২৫৭১)

আবু ইয়াহইয়া সুহাইব ইবনু সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন,

> 'মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়। (মুসলিম ২৯৯৯)

তাই ক্যান্সার ছিল আলি বানাতের দ্বীনের পথে আসার উপলক্ষ, তাঁর গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনেও অনেক পরীক্ষা, দুঃখ-বেদনা, বিপদ আসে। আমরা হয়তো হতাশ হয়ে পড়ি, কেন আমার সাথেই এমনটা হলো এই ভেবে আল্লাহর নাফরমানি করি। কিন্তু হয়তো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার, আল্লাহ হয়তো তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার উপলক্ষ তৈরি করে দিয়েছেন।

২। MATW Project—সাদকায়ে জারিয়া।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর আলি বানাত একদিন কবরস্থানে তার এক বন্ধুর কবরের পাশে যান, যে বন্ধুও কিছুদিন আগে ক্যান্সারে ভুগে মারা গেছে। সেখানে গিয়ে আলি বানাতের উপলব্ধি হয়, এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর মানুষের ধনসম্পদ, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব কিছুই কোনো কাজে আসবে না, কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। রক্ষা করবে শুধু আমাদের আমল, আল্লাহর পথে আমাদের রেখে যাওয়া কাজ। এরপর আলি বানাত MATW প্রজেক্ট নামের চ্যারিটি শুরু করেন যা আফ্রিকায় গরীব শিশুদের জন্য স্কুল, মসজিদ তৈরির কাজ করে। সেই চ্যারিটি এখনো আছে এবং ইনশাআল্লাহ যতদিন এই প্রজেক্ট চলমান থাকবে তা আলি বানাতের জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কাজ করবে।

৩। পবিত্র রমযান মাসে মৃত্যু।

একজন মানুষের আমল কবুল হওয়ার নিদর্শন হলো সুন্দর মৃত্যু, যা আলি বানাত পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যু হয়েছে রমযান মাসে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ডাক্তার তাকে সময় দিয়েছিল সাত মাস। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আলি বানাত প্রায়

তিন বছর বেঁচে ছিলেন। এই তিন বছরে আল্লাহর পথে তাঁর চেষ্টা, সংগ্রাম, সাদাকা—সবকিছুর পরিণতিতে তাঁর ভাগ্যে জুটেছে একটি সুন্দর মৃত্যু। ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে কেউ সিয়াম পালন করবে এবং সেটাই তাঁর শেষ আমল হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আলিকে নিয়ে আমি একটা চমৎকার ঘটনা শেয়ার করতে চাই, যা আলি জীবিত থাকা অবস্থায় আমি তাকে বলতে চাইনি, তার জন্য ফিতনা হতে পারে ভেবে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর কিতাবে বলেছেন,

> "মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হলো মহা সফলতা।" (সূরাহ ইউনুস, ১০: ৬২-৬৪)

আবু দারদা (রা.) একদিন রাসূল (সা.) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী সেই সুসংবাদ যা মুমিন ব্যক্তি এই দুনিয়াতেই লাভ করবে? রাসূল (সা.) বললেন, আবু দারদা! এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেউ এই বিষয়ে জানতে চায়নি। তুমিই প্রথম জানতে চাইলে। আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর আউলিয়া এই দুনিয়াতে যে সুসংবাদ পেয়ে থাকে সেটা হলো ভালো স্বপ্ন যা মৃত্যুশয্যায় সে নিজে দেখে অথবা তার হয়ে অন্য কেউ দেখে থাকে।[১]

আলি বানাতকে নিয়ে এমন এক স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের ভাই সাফওয়ান। তিনি স্বপ্নে দেখলেন আলি বানাত একটি গাছ বেয়ে উপরে উঠছে, এর চূড়ায় উঠে সেখান থেকে আলি নীচে পড়ে গেল, এবং সে দেখল সেসময় আমিও (মুহাম্মাদ হোবলোস) সেখানে, আর আমার পাশে সাফওয়ান দাঁড়ানো। এটি একটি সুন্দর স্বপ্ন। এটাকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করেছি, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> "পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। (সূরাহ ইবরাহিম, ১৪:২৪)

স্বপ্নের সেই গাছটি হলো পবিত্র বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আলি সেই গাছ বেয়ে উপরে উঠেছে, অতপর সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর মৃত্যুবরণ করেছে। এবং ওয়াল্লাহি, সত্যি সত্যি তার মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময় আগে আমি আর

---

[১] তাফসীর ইবনু কাসির

সাফওয়ান হাসপাতালে তার বেডের পাশে ছিলাম। সে চোখ খুলে আমাদের দেখল। আমি তাকে বললাম, আলি! বল আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানআল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে বলল, এবং তার কিছু ঘন্টা পর আমাদের ভাই আলি বানাত তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আর আমরা খুব করে চাই আল্লাহ যেন আমাদের ভাই আলি বানাতকে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর সেই আউলিয়া, বন্ধু হিসেবে কবুল করেন।

কিন্তু আলি বানাতের হৃদয়স্পর্শী গল্পটার শেষ শিক্ষাটা আলি বানাতের জন্য আমাদের আফসোস নয়, শিক্ষাটা হলো— নিজেদের কাছে কিছু প্রশ্ন! আমাদের কী হবে? আমাদের পরিণতি কেমন হবে?

অনিশ্চয়তাপূর্ণ এ জীবনে আমাদের একমাত্র নিশ্চিত বিষয় হলো মৃত্যু। আমাদের অর্থ, সম্পদ, স্ট্যাটাস কোনো কিছুর গ্যারান্টি নেই। কাল সকালে উঠে আপনার পরিবারের সদস্যদের দেখতে পাবেন—এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। এক মুহূর্তে জীবন পাল্টে যেতে পারে। যা কিছুর পেছনে আমরা সব সময়, শ্রম, চিন্তা ঢেলে দেই তার সবকিছুই নশ্বর। এক্সপাইয়ারি ডেইট লাগানো এক স্বপ্নের পেছনে আমরা জীবনটা বিক্রি করে দেই। অথচ আমাদের উচিৎ আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

অনেক সময় বড় কোনো বিপর্যয়ের পরই মানুষ চিরন্তন সত্যকে চিনতে পারে। সহজ, নিশ্চিন্ত, নিরাপদ একটা জীবন আমাদের অনেককে জীবনের সত্য সম্পর্কে ভুলিয়ে রাখে। আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে ভাসতে থাকা এই অকৃতজ্ঞ আমরা আল্লাহকেই ভুলে যাই। ভাই আলির মতোই—সব ক্ষয়িষ্ণু আনন্দের ধ্বংসকারী মৃত্যু—আমাদের জন্যও অপেক্ষা করছে। আপনার-আমার জন্য সময় নির্ধারিত হয়ে গেছে, আর সমগ্র সৃষ্টি মিলেও একে ন্যানোসেকেন্ডও পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু আমরা কি জানি আমরা কবরে কী নিয়ে যাচ্ছি? আমরা কি জানি আমরা কবরের প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারব কি না?

মানুষ আপনার জন্য চোখ মুছছে, দুআ করছে। আপনাকে কবরে নামানো হচ্ছে। ছোট্ট, সংকীর্ণ, অন্ধকার, ভারী। আপনার জন্য দুআ করা হচ্ছে আর আপনি দমবন্ধ করা সংকোচনে হাহাকার করছেন। প্রচন্ড ওজন আপনার ওপর চেপে বসেছে। আপনার জন্য দুআ হচ্ছে। তারা ওপরে, আপনি নিচে। তারা আলোতে, আপনি অন্ধকারে। আপনার চেনা মুখগুলো, আপনার প্রিয় মানুষগুলো—এই তো আর কিছুক্ষণ পর আপনাকে এই গর্তে শুইয়ে রেখে যার যার মতো বাড়ি ফিরে যাবে। নিজ নিজ স্ত্রী, সন্তানের কাছে—নিজ নিজ জীবনে। আপনাকে এই মাটির

ঘরে ফেলে যাবে। আপনি একা, কেউ নেই পাশে। আর তারা চল্লিশ কদম যাবার সাথে সাথেই আসবে প্রশ্নকারীরা...

কী প্রস্তুত করেছি আমরা এই দিনটির জন্য? কীভাবে বাঁচবেন? একবার চোখ বন্ধ করার পর আপনি চোখ খুলবেন রাজাদের রাজার সামনে—আল্লাহ আযযা ওয়া জাল এর সামনে...কী নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবেন?

এই ধূলোমাটিই হলো সবচেয়ে ধনীদের শেষ পরিণতি। এই ধূলো সবচেয়ে আকর্ষনীয়, সবচেয়ে সুন্দর শরীরের নারীর শেষ পরিণতি। এই ধূলোই ক্ষমতাধরদের শেষ পরিণতি—এই ধূলোই আমাদের সবার শেষ পরিণতি। From dust, To dust...

কী প্রস্তুত করেছি আমরা? আলি বানাত মৃত্যুর আগে প্রায় ৮ কোটি টাকা সাদাকা করেছিলেন। আমরা সম্ভবত যাকাতটাও ঠিক মতো দেই না। নামায পড়ার সময় কই? রোজার অবসরগুলো কাটে মার্কেটে ছুটোছুটি করে।?

আখিরাত এসে আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে...আমরা উদাসীন।

> 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপস্থিত হচ্ছ...তারপর সেদিন অবশ্যই তোমরা নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' (সূরা তাকাসুর, আয়াত ১, ২ এবং ৮)

সুতরাং, গতকালও এই পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ মারা গেছে। পৃথিবীর কোনো কিছুই থেমে থাকেনি। কারো জীবন এতে থমকে যায়নি। এভাবে একদিন আপনিও মারা যাবেন, পৃথিবীর কিচ্ছু আসে যাবে না। আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাও, কষ্ট পাবে হয়তো, কিন্তু ঠিকই জীবনটা গুছিয়ে নেবে, এগিয়ে যাবে। অথচ এই পৃথিবী ঘিরে আমাদের কত স্বপ্ন, কত পরিকল্পনা আর পাওয়া না পাওয়ার হিসেব! একদিন মৃত্যু এসে মনে করিয়ে দেবে এই পৃথিবী আসলে আমাদের নয়। আমাদের গন্তব্যস্থল আর চূড়ান্ত আবাস অন্য কোথাও। দিনশেষে শুধু পৃথিবীতে থেকে যাবে আমাদের ফেলে যাওয়া কিছু কর্ম, হঠাৎ হঠাৎ প্রিয়জনদের মজলিসে দু'লাইন আবেগঘন স্মৃতিচারণ, কিংবা কবরের পাশে একটি ধুলোমাখা 'এপিটাফ'।

বাটারফ্লাই বয়

আজকাল কোনো যুবক যদি আয়নায় তাকিয়ে চেহারায় সামান্য একটা পিম্পল কিংবা কোনো দাগও দেখে—সে আঁতকে উঠে। নিমিষেই তার মন খারাপ হয়ে যায়—হতাশ হয়ে পড়ে। অথচ আমার বন্ধু বাসিতের কাছে এটা হয়তো এমন কিছু যা নিয়ে তার ভাবারও সময় নেই। বাসিত EB (Epidermolysis Bullosa) নামের একটা রোগে ভুগছে, যার ফলে তার শরীরজুড়ে ঘা এবং চামড়ায় ফোস্কা তৈরি হয়। এই ঘা সহজে শুকায়ও না, তাই বাসিতকে এই ঘা সবসময় ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। এই রোগের আরেকটি নাম হলো ***'Butterfly Baby'***। কারণ এই রোগের ফলে সারা শরীরে ঘা হতে থাকে, ফলে পুরো শরীর ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়—যা অনেকটা রেশমের গুটির মতো দেখায়।

এই অবস্থায় বেঁচে থাকা কতটা কষ্টের এমন প্রশ্নের জবাবে বাসিত বলেছে,

> 'এটা কঠিন, কারণ আমার শরীরের বেশিরভাগ অংশই মূলত অচল। ফলে সারাদিন আমাকে বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়। আমি সেভাবে কোনো কাজকর্মও করতে পারি না। মানুষ যেভাবে স্বাভাবিক হাঁটাচলা করে, দৌড়ায়—এসবের কিছুই আমি করতে পারি না। আমি শুধু দেখি আর ভাবি—ইশ! যদি আমিও এভাবে হাঁটাচলা করতে পারতাম!'

বাসিতের মুখে এই কথাগুলো খুব কষ্টের। এই রোগের জন্য যে চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বাসিতকে যেতে হয় সেটা আরও কষ্টের। এটা তার জন্য আরেকটি পরীক্ষা। ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে কাটাতে হয় ব্যান্ডেজ কাটা, শরীরে মোড়ানো, ঘা এর স্থানে মলম লাগানোর কাজে। এ ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। এটাই তার নিত্যদিনের রুটিন। বাসিতের ভাষায়,

> 'আমাকে এভাবেই প্রতিটা দিন কাটাতে হয়। যদি আমি প্রতিদিন এটা না করি তাহলে ঘা পচে পুঁজ বের হয়, দুর্গন্ধ ছড়ায়। যেদিন আমি গোসল করি

> সেদিন এই কাজে আমার ছয় ঘণ্টায় মতো ব্যয় হয়। আর অন্যান্য দিনে সেটা চার ঘণ্টার মতো লাগে।'

বাসিত এভাবে প্রতিটি দিন কেমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায় সেটা সত্যি আমাদের কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমি চিন্তাও করতে পারি না একটা মানুষকে প্রতিদিন এভাবে ঘন্টার পর ঘণ্টা বিছানায় পড়ে থাকতে হয়, তার শরীরে পচন ধরছে, তার হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গেছে! অকল্পনীয়! বাসিতের এই দুর্বিষহ জীবন আমাকে নবি আইয়ুব (আ.) এর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনিও এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন—যার ফলে শরীরে পচন ধরেছিল। তাঁকে এভাবেই বিছানায় পড়ে থাকতে হতো, সমাজ থেকে তিনি আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। এতকিছুর পরও তিনি ধৈর্যের উপর অটল ছিলেন, আশা হারাননি। এমন এক ধৈর্যের পরীক্ষায় আমাদের ভাই বাসিতকেও যেতে হয়, প্রতিদিন, প্রতিটি সময়।

এই অবস্থায় বাসিতের কাছে ইসলামে বিশ্বাসের গুরুত্ব কতটুকু? বাসিত বলেন,

> 'সত্যি বলতে বিশ্বাস ছাড়া এই জীবনের অর্থই বা কী? কী উদ্দেশ্য হতে পারে এই জীবনের? অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে হয়তো কবেই আত্মহত্যা করে বসতাম! এভাবে প্রতিনিয়ত কষ্টের মধ্য দিয়ে যাওয়া, নিজের কষ্ট, আমার জন্য পরিবারের অন্যদের কষ্ট—এসবকিছু ভোগ করার পর যদি আখিরাতে আমার জন্য কিছু না-ই থাকে তাহলে তো সবকিছু অর্থহীন। তাই আখিরাতের উপর বিশ্বাসই আমাকে টিকিয়ে রেখেছে। আমার এই সীমাহীন কষ্ট আর দুর্ভোগকেও অর্থবহ করেছে।'

ইসলাম দুনিয়াতে আমাদের এই দুঃখকষ্ট, বিপদাপদের সত্যিকারের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে, যা অন্য কোনোভাবে বোঝা সম্ভব নয়। দুনিয়াতে আজকের এই পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করো—আগামীকাল আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার বুঝে নাও। এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় মনোবলই আমাদেরকে দুনিয়ার এই কষ্ট, পরীক্ষার সময় ধৈর্য ধরতে সাহায্য করে। আল্লাহ বান্দারা এই আশাতেই দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকে। বাসিতের ভাষায়,

> 'যখন আমি আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে শুনি, আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে জানি, তখন আল্লাহর সেই ওয়াদার জন্য এই কষ্ট, সংগ্রাম আমার কাছে সহজ হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস আমাকে আশাবাদী করে তোলে। আমার এই বিশ্বাস কোনো কল্পনারাজ্য নয় অবশ্যই, আমি ইয়াকিনের সাথে বিশ্বাস করি। কিন্তু আল্লাহর পথে টিকে থাকার এই সংগ্রামে আপনাকে

ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ রোজ হাশরের দিনে আমরা দুনিয়াতে আমাদের এই ধৈর্যের ফল পাব। এই বিশ্বাসটুকুই বলে দেয়—আমার এই জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে।'

জীবনের পথে বাসিতের এই অধ্যবসায় সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ী। সে জানে দুনিয়ার এই জীবনটা তার জন্য পরীক্ষা, আর এই পথে তাকে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে।

দুই বছর আগে বাসিতের বড় ভাই মিলাদও এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় জীবনের এই কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। বাসিতের মতো তার ভাই মিলাদও একই রোগে ভুগছিল (EB), কিন্তু মিলাদের রোগের অবস্থা ছিল আরও খারাপ।

নিজের ভাইকে হারানো কতটা কষ্টের, এমন প্রশ্নের জবাবে বাসিত বলেন,

'এটা কঠিন। এ যেন নিজেরই একটা অংশ হারিয়ে ফেলা। আমি তার কাছ থেকে অনেককিছু শিখেছি। আমার চেয়ে তার অবস্থা আরও খারাপ ছিল। সত্যি বলতে আজকে আমার যা কিছু সহ্য ক্ষমতা আর ধৈর্য শক্তি তা আমার ভাইকে দেখেই হয়েছে। যখন আমি আমাদের দুজনের সীমাহীন কষ্ট আর দুর্দশার কথা মনে করি, আমি অনুভব করি যেন আল্লাহ আমাদের দুজনকে তার সমগ্র সৃষ্টি থেকে আলাদাভাবে বেছে নিয়েছেন। এ যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বোনাস পয়েন্ট। আমার ভাইয়ের যে ধৈর্য আমি দেখেছি, ইনশাআল্লাহ আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে উঁচু মর্যাদা দান করবেন। যখন আমি তার কবরের কাছে যাই আমার মনে হয় তার জন্য আমরা কাঁদব কী, সেই যেন আমাদের জন্য কাঁদছে, কারণ এখনও আমরা দুনিয়ার এই পরীক্ষার শিকলে বাঁধা পড়ে আছি!'

এরকম কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েও বাসিত দৃঢ়তার সাথে টিকে আছে, ভেঙে পড়েনি। শুধুমাত্র মানসিক দৃঢ়তাই নয়, তার প্রতিদিনের জীবনেও। এই অবস্থাতেও সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছে, বন্ধুবান্ধব তৈরি করেছে, এমনকি ওমরাহ সম্পন্ন করেছে। তবে তার এই কঠিন অধ্যবসায়ের আরও একটি গোপন রহস্য আছে। বাসিত বলেন,

'দ্বীন অবশ্যই আমার এই জীবনের সবচেয়ে মজবুত ভিত্তি, কিন্তু আমার পিতামাতার ভূমিকাও এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আলহামদুলিল্লাহ আমার

পিতামাতার জন্য, তাদের জন্য আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি। কারণ তারাই আমার জীবনটাকে সহজ করেছে। তারা আছে বলেই আমাকে কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত হতে হয় না। আমাকে শুধু আমার নিজেকে নিয়ে, আমার এই রোগ আর এর আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়েই চিন্তা করতে হয়, এর বাইরে অন্য কোনোকিছু নিয়ে, এমনকি আমার পিতামাতাকে নিয়েও আমাকে ভাবতে হয় না। তারা কখনও অভিযোগ করেন না। যেন এসবকিছু খুবই স্বাভাবিক, তারা সবকিছুকে স্বাভাবিক বানিয়ে নিয়েছে। এজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।'

যদি তুমি তাদেরকে কিছু দিতে চাও, তাহলে কী দেবে? বাসিত বলেন,

'আমি সবসময় আমার পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি। আমার কারণে যদি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দেন, যদি জান্নাতে আমরা সবাই একত্রিত হতে পারি, এটাই হবে সবচেয়ে বড় পাওয়া, এটাই আমার পিতামাতার জন্য সবচেয়ে বড় গিফট।'

আমি জানি এই দুনিয়ার জীবনটা একটি পরীক্ষা। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি আমাকে এই সত্যটুকু বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর সত্যিকারের জীবন তো শুরু হবে তখনই, যখন আমি আমার পরিবারের সাথে জান্নাতে মিলিত হবো।'

বাসিতের এই জীবনের গল্প আমাদের আধুনিক, যান্ত্রিক জীবনে সত্যিকারের ধৈর্যের উদাহরণ, যেখান থেকে আমাদের অনেককিছু শেখার আছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ যেন বাসিতকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাকে এমন দলে শামিল করে যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন, এবং তাকে রহমতের চাদরে ঢেকে রাখেন আমৃত্যু। আর দুনিয়ার ওপারে যে জীবনটা আছে, সেই আখিরাতে আল্লাহ যেন তাকে তার পরিবারের সাথে জান্নাতে একত্রিত করেন। আমীন।

'বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।" (সূরাহ আয যুমার ৩৯: ১০)

MAN VS MALE

ছেলে বা পুরুষ পরিচয় বোঝাতে সাধারণত আমরা 'Man বা 'Male' শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু প্রত্যেক 'Man' একজন 'Male' হলেও, প্রত্যেক 'Male' ই 'Man' না! কাউকে যদি প্রশ্ন করেন, ভাই আপনি 'Man' নাকি 'Male'? মুহূর্তেই সে হয়তো রেগে যেতে পারে। কারণ সে ভাববে এই প্রশ্ন করে আপনি তার 'পৌরুষ' নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন!

কিন্তু 'Male' হওয়াটা কাউকে স্পেশাল বানায় না। কারণ আপনি 'Male' হিসেবে জন্মেছেনই। তার উপর আজকের যুগে তো কেউ চাইলে সার্জারি করে নিজেকে 'Male' বানিয়ে নিতে পারে। এমনকি 'Male' হওয়ার জন্য আজকে আপনার শারীরিকভাবে 'Male' হওয়ারও দরকার নেই। আপনি যদি মনে করেন আপনি 'Male', পশ্চিমের অনেক দেশে আপনাকে 'Male' হিসেবে সুরক্ষা দেবে, এমন আইনও আছে। সেখানকার তথাকথিত 'ফ্রিডম' এর কারণে আপনি নিজের পরিচয় নিজেই নির্ধারণ করতে পারবেন, আপনার শারীরিক গঠন যাই হোক না কেন! শুধু চিন্তা করবেন, অনুভব করবেন যে, আপনি 'Male', ব্যস!

তাই 'Male' হওয়ার মাঝে স্পেশাল কিছু নেই। কিন্তু 'Man' হওয়া, এটা সার্জারির মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর কোনো হরমুন নেই। 'Man' হওয়াটা এমন কিছু নয় যা আপনি অন্তরে অনুভব করলেন, কিংবা মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাবি করে বসলেন! কিংবা হাত-গায়ে ট্যাটু লাগিয়ে ঘুরলেই 'Man' হওয়া যায় না!

কুরআনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সম্বোধনের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন—রিজাল—Man! আর এমনিতে সাধারণ সম্বোধনের সময় যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটা হলো—যাকার—Male! আল্লাহ কুরআনেই Male আর Man এর মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো আমরা আল্লাহর সামনে কী হিসেবে দাঁড়াতে চাই—রিজাল নাকি যাকার? তার আগে প্রশ্ন হলো কিসে নির্ধারণ করবে রিজাল কে? রিজাল হওয়ার মানদণ্ড কী?

দুঃখজনকভাবে আমাদের সমাজে যেকোনো কিছুর নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সোশ্যাল মিডিয়া, মুভি, মিউজিক, বিনোদন দুনিয়া আমাদের সমাজের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ইসলাম চর্চা করেন এমন মানুষও জাহিলিয়াতের বিষয়গুলো ধারণ করেন এবং সেগুলোকে ইসলামের সাথে জুড়ে দিতে চান।

এই সমাজে কেউ যদি একটু বডি বানাতে পারে, রাস্তাঘাটে মারামারি করতে পারে, তাদেরকে Man হিসেবে ধরা হয়। যে কারণে MMA, বক্সিং, রেসলিং এসব আমাদের কাছে চরম জনপ্রিয়। তাই আজকের সমাজে আপনি যদি মারামারি, কুস্তিগিরি এসব করতে না জানেন, তাহলে আপনাকে Man হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। মজার ব্যাপার হলো এই ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আজকের নয়। এমনকি সাহাবিদের সময়েও মানদণ্ডটা এমন ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল (সা.) সেই ভুল ভেঙে দিয়েছেন।

একদিন কিছু সাহাবি কুস্তি খেলছিলেন। সেসময় রাসূল (সা.) সেখানে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা.) কিন্তু নিজের চোখে দেখছেন সাহাবিরা কী করছে। কিন্তু তিনি সাহাবিদের একটি শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

—তোমরা কী করছ?

সাহাবিরা জবাব দিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কুস্তি লড়ছি।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন,

—তোমরা কুস্তি লড়ছ কেন?

সাহাবিরা উত্তর দিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কুস্তি লড়ছি এটা দেখার জন্য যে, আমাদের মধ্যে শক্তিশালী কে?

আজ ১৪০০ বছর পরেও এখনো আমাদের সমাজেও এটাই ক্রাইটেরিয়া।

এমন না যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) জানতেন না সাহাবিরা কেন কুস্তি লড়ছে। কিন্তু তিনি ছিলেন মানুষের অন্তরের চিকিৎসক। তিনি সত্যিকারের পুরুষ—রিজাল নির্ধারণের এই মানদণ্ডটা ভেঙে দিতে চাইলেন। এর পেছনে অন্তরের যে গভীর ব্যাধি লুকিয়ে আছে, সেটা আরোগ্য করতে চাইলেন। তাই তিনি বললেন,

—প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।[২]

রাসূল (সা.) বোঝাতে চাইলেন, গায়ের জোরে তো কেউ চাইলে যে কাউকে হারাতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের মধ্যে কে শক্তিশালী আর কে শক্তিশালী না—এটা নির্ধারণ করি না।

আমাদের সমাজে 'রিজাল' নির্ধারণের আরেকটি ভুল পদ্ধতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সিক্স প্যাক, বডি বিল্ডার, স্টেরয়েড খেয়ে যারা বডি বানায়, আমরা মনে করছি তারাই সত্যিকারের পুরুষ। কারণ 'small man syndrome' নামের ব্যাধি আমাদের মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এটা হলো এমন এক ব্যাধি যেখানে গায়ে-গরতে যারা একটু ছোট তারা মনে করে বাকিরা তাদেরকে খুব একটা সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। তাই তারা এমন সব কাজ করে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে, যা তাদের চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না। আজ যারা কৃত্রিমভাবে স্টেরয়েড দিয়ে নিজেদের বডি বিল্ডার বানাতে প্রতিযোগিতা করছে, তাদের প্রায় সবাই-ই এই small man syndrome এ আক্রান্ত। এরা প্রতিনিয়ত মানসিক হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে।

অনেক ভাইয়েরা অসাধারণ বেঞ্চ প্রেস করতে পারে। অনেকে তো রেকর্ডও করে ফেলে। সুযোগ পেলেই তারা কয়েকজন মিলে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়, কে কয়টা দিতে পারে। মোবাইল এপে এসবের হিসেব রাখে, ফেসবুকে, ইন্সটাগ্রামে ভিডিও শেয়ার দেয়! কিন্তু সেই একই ভাইয়েরা ফজরের সময় সামান্য কম্বলটা গায়ের উপর থেকে সরাতে পারে না।

একবার রাসূল (সা.) দেখলেন সাহাবিরা একটি খেজুর গাছের চারপাশে জড়ো হয়েছেন। রাসূল (সা.) সেই জমায়েতে গিয়ে দেখলেন, গাছের উপর আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.), আর নীচে সাহাবিরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। রাসূল (সা.) বললেন,

—তোমরা কী নিয়ে হাসাহাসি করছ? তোমরা কী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের জীর্ণ-শীর্ণ পা জোড়া দেখে হাসছ?

—হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেখুন তার পা দুটো কেমন জীর্ণশীর্ণ।

[২] মুসলিম: ৪৫/৩০, হাদিস নং ২৬০৯, আহমাদ ৭২২৩

জবাবে রাসূল (সা.) বললেন,

—আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের এই হাড্ডিসার পা জোড়া কিয়ামতের দিন ওজনে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারী হবে।

তাই—রিজাল—সতিকারের পুরুষ হওয়ার মানদণ্ড গায়ের জোর নয়। প্রোটিন শেক, স্টেরয়েড খেয়ে সিক্স প্যাক, মাসল বানিয়ে 'রিজাল' হওয়া যায় না। অন্যদের দিকে দুটা তর্জন গর্জন করতে পারলে সেটার ভিত্তিতে 'রিজাল' নির্ধারিত হয় না। 'রিজাল' এর মানদণ্ড হলো—তাকওয়া, ঈমান।

সমাজে 'পুরুষ' নির্ধারণের আরেকটি মানদণ্ড এখন বেশ জনপ্রিয়—টাকা। টাকার গন্ধে আমরা আচ্ছন্দ থাকি। কেউ যদি বলে তার টাকার প্রতি কোনোই আকর্ষণ নেই, টাকার কোনো জরুরত নেই—তাহলে সেটা বিশ্বাস করা কষ্ট। কেননা, আমাদের রব, মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরআনে মানুষের স্বভাব বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> "এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালোবাস।" (সূরাহ ফাজর, ৮৯:২০)

যেখানে স্বয়ং আল্লাহ বলছেন মানুষের স্বভাব হচ্ছে সে ধনসম্পদ ভালোবাসে, সেখানে কীভাবে আমরা সেটা অস্বীকার করি!

আজকে যদি আপনার টাকা থাকে তাহলে "শায়খ" ও বনে যেতে পারেন। টাকার জোরে মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান, ওয়াজ মাহফিলের বিশেষ বক্তা, প্রধান অতিথি, সবখানে আপনার শুধু একটা যোগ্যতা থাকা চাই—টাকা! আর আমরাও তাকেই দাম দিই, সেই আমাদের কাছে সত্যিকারের 'পুরুষ'—রিজাল!

কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা এই যে রিজাল বা পুরুষ নির্ধারণের দুনিয়াবি মানদণ্ডগুলো সেট করেছি, সেই হিসেবে কি আমাদের নবিজি (সা.) রিজাল ছিলেন? সাহাবিরা? তাবিয়ি, তাবে তাবিয়িন? আমি জানি এই প্রশ্ন আমাদেরকে বিব্রত করে দেবে। থমকে যাব আমরা। কিন্তু এটাই আমাদের বাস্তবতা। নববি আদর্শের সে পথ থেকে আমরা এভাবেই, এততাই বিচ্যুত হয়ে গেছি।

বিয়ের পাত্র নির্বাচনের সময় আমাদের অনেক বোন ফ্যান্টাসিতে থাকেন। নবিজি (সা.) এর মতো, সাহাবিদের মতো কাউকে তারা স্বামী হিসেবে চান। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি সেই সাহাবিদের মতো জীর্ণ-শীর্ণ জামা, ধুলোমাখা পা, সহায় সম্বলহীন কেউ এসে সামনে দাঁড়ায়, তখনও কি আমরা এরকম কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে

পছন্দ করব? 'আদর্শ স্বামী' নির্বাচনের মানদণ্ড কি তখনো একই থাকবে? আমার মেয়ের, বোনের হাত কি এমন কারো হাতে তুলে দেব? নাকি দুনিয়ার মানদণ্ডে 'পুরুষ' হওয়ার যে ক্রাইটেরিয়া আমরা বানিয়ে নিয়েছি, সেগুলোই বিবেচ্য হবে—বড়ি বিল্ডার—টাকা?

ধনসম্পদে বড় হতে পারলেই সে পুরুষ, টাকা-পয়সা থাকা মানেই সফলতা—এই ধারণা তৈরি হয় অন্তরের রোগ থেকে।

উরওয়াহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, আইশা (রা.) বলেন,

> "মাসের পর মাস চলে যেত, কিন্তু রাসূল (সা.) এর কোনো ঘরেই আগুন জ্বলত না। উরওয়াহ বলেন, 'আমি আমার খালা আইশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আপনারা কী খেয়ে দিন পার করতেন?'
>
> আইশা (রা.) বলেন, 'দুই কালো জিনিস। এক—পানি। দুই—খেজুর'"[৩]

অথচ এই সময় রাসূলের ঘরে একাধিক স্ত্রী ছিলেন। সত্যি সত্যি এমন কাউকে আমাদের বোনেরা বিয়ে করতে চাইবেন আজ? সত্যিই? আমাদের এই ফ্যান্টাসির জগৎ থেকে বের হওয়া উচিত। ফেসবুকে বসে নবিজি (সা.) আর সাহাবিদের মতো 'আদর্শ স্বামী'র অপেক্ষায় থাকার বুলি আওড়ানো সহজ, কিন্তু আসলেই কয়জন এই একবিংশ শতাব্দীতে তাদের মতো কারো স্ত্রী হয়ে জীবন যাপন করার জন্য তৈরি?

যখন এই হাদিসগুলো শুনি, আমাদের যে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, ভাবলেশহীন, বিলাসিতাময় জীবন যাপন করছি, তার তুলনায় বিশ্বাস করা কষ্টকর হয়ে যায়। আমরা কল্পনাও করতে পারি না। বস্তুবাদী দর্শনের এই একবিংশ শতাব্দীর জীবনের তুলনায় নবিজির সময়ের সেই জীবনগুলো যেন রুপকথার মতো! কিন্তু বাস্তবতা এমনই ছিল। এই দ্বীনের সত্যিকারের 'পুরুষ'দের জীবন ছিল এমনই সংগ্রামের। আর আজ আমরা দ্বীনের এই অংশটুকুর আলোচনা এড়িয়ে যেতে চাই। আমাদের প্রিয় নবিজি (সা.) বলেছেন,

> "নিশ্চয় ইসলাম নিঃসঙ্গ ও অপরিচত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, আবার অচিরেই তা নিঃসঙ্গ ও অপিরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের (নিঃসঙ্গ ও অপিরিচিত) জন্য সুসংবাদ।'

[৩] সালাফদের ক্ষুধা, ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া (রহ.), পৃ: ২৮, সীরাত পাবলিকেশন

যখন রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই গুরাবা কারা? জবাবে তিনি বললেন,

— "তারা কিছু ভালো মানুষ। খারাপ মানুষের বৃহৎ সংখ্যা সাপেক্ষে তাদের সংখ্যা হবে খুবই অল্প। তাদের অনুসারীর চেয়ে বিরোধিতাকারীর সংখ্যা হবে বেশি"

সুতরাং এই দ্বীন আবার সেই 'পুরুষ'দের কাছে ফিরে যাবে। বডিবিল্ডার, পয়সাওয়ালা, যাদের আমরা সমাজের 'পুরুষ' বলে স্বীকৃতি দিই, তাদের কাছে নয়।

আজকে আমাদের পোশাক কাফিরদের মতো, আমাদের খাবার কাফিরদের মতো, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি, চালচলন, বেশভূষা সবকিছুতে কাফিরদের অনুসরণ! আমাদের ঘর, আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, স্বপ্ন সবকিছু দুনিয়াকে ঘিরে—আপাদমস্তক কাফিরদের মতো! অথচ আমরা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মুসলিম! আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ৯০% মুসলিমের দেশ! শুক্রবারে জুম'আ পড়ে সেলফি আপলোড দিচ্ছি—জুমা মুবারক! এতটুকুই, বাকি সবকিছু কাফিরদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের দ্বীন এতটুকুতেই আটকে আছে!

তাই আজকে যখন আমরা নবিজির ঘরে দিনের পর দিন খাবার রান্না না হওয়ার হাদিস শুনি, সাহাবিদের কুরবানি আর আত্মত্যাগের 'অবিশ্বাস্য' সব বর্ণনা শুনি, কিছুটা আমতা আমতা করে বলতে চাই, 'দেখুন ভাই, হ্যাঁ এসব ঘটেছে, কিন্তু এসব তো আর উদাহরণ নয়, এসব তো সুন্নাহ নয়! আমাদেরকেও এরকম করতে হবে এমন তো কথা নেই। এখন যুগ পাল্টেছে, আমাদেরকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।'

এভাবে আমরা সবাই নিজেদের নিফাক থেকে পালিয়ে বেড়াই। কেউ নিজেদের অন্তরের রোগ স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। দ্বীন থেকে নিজেদের পছন্দমতো 'সুগার কোট' করে আমরা নিজেদের জন্য সান্ত্বনা তৈরি করি। আমরা যে জীবনটা যাপন করছি তার জন্য জাস্টিফিকেশন আমাদের সবসময় তৈরি থাকে। কিন্তু আপনাকে কেউ পানি আর খেজুর খেয়ে জীবন যাপন করতে বলছে না। শুধু দ্বীন থেকে দুনিয়াকে একটু আলাদা রাখুন। যে জীবনটা যাপন করছেন সেটাই বা কতটুকু 'ইসলামিক', কতটুকু দ্বীন সেখানে চর্চা করা হয় সেটা নিয়ে একবার ভাবুন। হালাল হারামটুকু অন্তত মানুন। বিলাসিতাটুকু অন্তত ছাড়ুন।

রাসূল (সা.) যখন মারা যান তখন আইশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন,

—আমাদের কী পরিমাণ টাকা পয়সা আছে? আইশা (রা.) জবাব দিলেন

—সাতটি স্বর্ণমুদ্রা। রাসূল (সা.) বললেন,

—এগুলো সাদাকা করে দাও। এরপর নবিজি (সা.) বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন জ্ঞান ফিরল, তিনি আবার আইশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন,

—ইয়া আইশা! সাতটি মুদ্রার কী করলে? আইশা জবাব দিলেন,

—ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনো আমার কাছেই আছে। রাসূল (সা.) বললেন,

—তুমি কি চাও আমি আল্লাহর কাছে এই অবস্থায় উপস্থিত হই, যখন দুনিয়ার কোনো কিছু এখনো আমার মালিকানায় রয়ে গেছে?

আমাদের চারপাশে অধিকাংশ মানুষ এমন, যারা চলার মতো যথেষ্ট সচ্ছল কিন্তু তারপরও তারা রাতদিন খেটে মরছে। এরা সারাদিন ব্যস্ত। তারা আবার হাদিস শুনাবে, নবিজি পরিবারের জন্য সম্পদ রেখে যেতে বলেছেন। সহিহ! কিন্তু কতটুকু? কতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ জমা করতে থাকবেন? মৃত্যু পর্যন্ত? দুনিয়াতে শুধু এজন্যই আমরা বেঁচে আছি?

আল্লাহর নবি (সা.)। যিনি দুআ করলে আল্লাহ আসমান থেকে স্বর্ণের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে দিতেন, যিনি দুআ করলে আসমান জমিনের সমস্ত সম্পদ আল্লাহ তাঁর অধীনে দিয়ে দিতেন। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন,

" اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا "

> “হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী (পরিমাণ) রিযিকের ব্যবস্থা করুন। (ইবনু মাজাহ- ৪১৩৯, সহিহ)

কেবল বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার, কোনোমতে চলতে পারার মতো, কোনোমতে দুনিয়াটা পার হওয়ার মতো। সুবহানআল্লাহ।

আজকে কোনো মসজিদে ইমাম যদি এই দুআ করে, না জানি তার কী হয়! মসজিদ কমিটির তোপে পড়ে আবার চাকরিটা না খুইয়ে দিতে হয়। অথচ এটাই ছিল পরিবারের জন্য আমাদের নবিজি (সা.) এর দুআ। এভাবে দুনিয়া আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গেছে। এখানে সবকিছু এখন পয়সা দিয়ে নির্ধারিত হয়।

একদিন জুম'আর খুতবায় নবিজি (সা.) বললেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে এই দুনিয়ার রাজত্ব আর তাঁর সাথে সাক্ষাতের মাঝে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার অপশন দিয়েছেন। আল্লাহর সেই বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে বেছে নিয়েছে।

নবিজির কাছে অপশন দেওয়া হয়েছিল, হয় দুনিয়ায় বাদশা এবং নবি হয়ে থাকার, অথবা গোলাম এবং নবি হয়ে থাকার। নবিজি নিজেই গোলাম এবং নবি হওয়াকে বেছে নিয়েছেন।

তাই দুনিয়াতে নবিজি (সা.) এর যে দুঃখকষ্ট, কঠিন জীবনের ব্যাপারে জেনে আমরা অবাক হই, ব্যাপারটা এমন না যে, তিনি বাধ্য হয়ে এমন জীবন যাপন করেছেন। এমন না যে, তাঁর কাছে আর কোনো অপশন ছিল না। নবিজি (সা.) এর কাছে সমস্ত সুযোগ ছিল আয়েশী করার, সুখে থাকার, প্রাচুর্যে থাকার। কিন্তু তিনি দুনিয়ার মূল্য জানতেন। তাই তিনি এই দুনিয়ার পেছনে নিজেকে বিকিয়ে দেননি।

সত্যিকারের পুরুষ হলো যার চিন্তা বাস্তবিক এবং যে মাটির সাথে জুড়ে থাকে। আর বোঝে—এই দুনিয়ায় আপনি সবকিছু পাবেন না। সবকিছু পাওয়ার জন্য, সবকিছু ভোগ করার জন্য এই দুনিয়া না, আমরা সেজন্য এখানে আসিওনি। অথচ আমাদের অবস্থা হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা দুনিয়াতেই সবকিছু চাই, এখানেই সবকিছু ভোগ করতে চাই।

সত্যিকারের রিজাল—পুরুষ, সে বোঝে জান্নাতের একটি মূল্য আছে, এবং সেই মূল্য চুকিয়ে তবেই জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। আর সেই মূল্য হলো—সেই স্যাকরিফাইস হলো—ইসলামকে 'লাইফস্টাইল' হিসেবে নেওয়া। ইসলামের সাথে বাঁচা, ইসলামকে সাথে নিয়েই মৃত্যুবরণ করা। সত্যিকারের 'পুরুষ' মানে হলো এই বোধটুকু থাকা যে, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার পরিবার আছে—এই দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে! আমি যখন ওয়াদা করি, লেনদেন করি, আমাকে ইসলামের প্রিন্সিপলের উপর থাকতে হবে, আমাকে স্যাকরিফাইস করতে হবে, আমাকে দায়িত্বের মূল্য চুকাতে হবে—এটাই রিজাল—সত্যিকারের পুরুষ! যা আজ আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেছে। আমাদের কাছে পুরুষ হওয়ার মানদণ্ড আজ অন্যকিছু। আমাদদের চারপাশে যারা পুরুষ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সত্যিকারের পুরুষত্বের মানদন্ডে এরা সবাই আসলে এখনো 'বালক'। যাদের পুরুষত্ব সিক্স প্যাক বডি, টাকার কাছে আটকে আছে। আমরা সর্বত্র নিজেদের

পুরুষ হিসেবে জাহির করতে চাই, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) 'পুরুষ' হওয়ার যেসব মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তার ধারেকাছেও আমরা নেই।

পুরুষ মানুষ মাত্রই নারীদের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। কোনো মেয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে হৃৎপিণ্ডের ধুপধুপানি শুরু হয়ে যায়। যদিও আমরা নারী সঙ্গ পেতে চাই—যেটা পুরুষের স্বাভাবিক ফিতরাত—কিন্তু আমরা এমন একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি যেখানে আমরা কেউ বিয়ে করতে রাজি নই। আমরা গার্লফ্রেন্ড বানাব, হাঁটে-মাঠে-ঘাটে-লিঠনের ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়াব, সব ঠিক আছে! কিন্তু বিয়ে? নো ওয়ে! বিয়ে, সংসার, স্ত্রীর প্রতি দায়বদ্ধতা, স্যাকরিফাইস, জীবনের চ্যালেঞ্জ এবং নানান দুঃখকষ্টের এই যে পথ—সেটা কেবল একজন রিজাল—সত্যিকারের পুরুষই পাড়ি দিতে পারে। এরাই হলো 'real man'। আর এ পথ যারা পাড়ি দিতে চায় না, যারা দায়িত্ব নিতে চায় না, এরা হলো male! সমাজে আজ চারদিকে শুধু 'Male', যার কারণে সহজলভ্য হয়েছে যিনা। কেউ আজ দায়িত্ব নিতে চায় না। তরুণরা লুকিয়ে বিয়ে করে, সবার অগোচরে, অনেক সময় ছেলে-মেয়ে উভয়ের পরিবারের অগোচরে। আবার সবার অগোচরে ছেড়েও দেয়। এরা দ্বীন নিয়ে তামাশা করে। নিজের পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে বিয়ের কথা বলার মতো, নিজের বউকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘরে তোলার মতো 'পৌরুষ' এদের নেই।

যিনা করতে পারার ক্ষমতা কাউকে 'পুরুষ' বানায় না। একটার পর একটা গার্লফ্রেন্ড পাল্টানো কারো পুরুষত্বের ক্রাইটেরিয়া নয়। সত্যিকারের পুরুষ হলো যারা দায়িত্ব নিতে জানে। সত্যিকারের পুরুষ যিনার পথ বন্ধ করে। সত্যিকারের পুরুষ বিয়ের পথ বেছে নেয়। সত্যিকারের পুরুষ জানে এই বিয়ে কোনো ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড নয়, এটা চ্যালেঞ্জ, স্যাকরিফাইস—যা সবাই পারে না। এর জন্য শুধু 'Male' হলে হয় না, 'Man' হতে হয়।

সবাই বাচ্চাকাচ্চা ভালোবাসে, আদর করে, কিন্তু 'বাবা' হওয়ার দায়িত্ব সবাই নিতে চায় না। কারণ এখানে চ্যালেঞ্জ আছে, স্যাকরিফাইস আছে, দায়িত্ববোধ আছে। কেবল সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে কেউ 'পুরুষ' হতে পারে না, বরং সেই সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বড় করার চ্যালেঞ্জ যে নিতে পারে, সত্যিকারের 'পিতা' হওয়ার স্যাকরিফাইস যে করতে পারে, সেই রিজাল—পুরুষ—The real man!

আমরা সবাই টাকা পয়সার পাগল। আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলেছেন, মানুষ টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ ভালোবাসে। কিন্তু সবাই সেটা অর্জনের জন্য পরিশ্রম

করতে চায় না। সবাই ঘাম ঝরাতে প্রস্তুত নয়। আর তাই হারাম ইনকাম আজ আমাদের কাছে তেমন কোনো সমস্যা না। শর্টকাটে, হারাম উপায়ে, মানুষের হক্ক মেরে, হারাম জিনিস বেচে, কোনোমতে টাকা কামানটাই আমাদের লক্ষ্য। কেননা, সমাজে 'পুরুষ' হওয়ার মানদণ্ড তো আমরা নির্ধারণ করেচ দিয়েছি—টাকা! কিন্তু যারা সত্যিকারের পুরুষ, তারা এই পথে হাঁটে না।

প্রত্যেক নবি তাঁদের জীবদ্দশায় কোনো না কোনো সময় রাখাল ছিলেন। আমাদের নবিজি (সা.) মালামাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেছেন। সাহাবিরা সবাই এরকম কাজ করে জীবিকা অর্জন করেছেন, আজকে আমাদের সমাজে যে কাজগুলোকে নীচু দৃষ্টিতে দেখা হয়, মানুষ নাক সিটকায়।

ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর (রা.)। একদিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এবং আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.) মদিনার বাজারে গিয়ে দেখেন, খলিফাতুল মুসলিমীন আবু বকর (রা.) বাজারে কাপড় বিক্রি করছে। তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—ইয়া আমিরুল মুমিনীন! এ আপনি কী করছেন? আপনি সারা মুসলিম জাহানের খলিফা, আর আপনি কিনা এখানে বসে বেচাবিক্রি করছেন? জবাবে আবু বকর (রা.) বললেন,

—কারণ আমার পরিবার আছে। আর আমাকেই তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

এরাই ছিলেন সত্যিকারের 'পুরুষ'। আর আজকে তো কেউ মসনদে বসতে পারা মানে কাড়ি কাড়ি টাকা চেটেপুটে খাওয়া, আয়েশী করে জনগণের টাকা উড়ানো।

আজকে আপনি যে কারো কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আপনি কি আল্লাহকে ভালোবাসেন? ইসলামকে ভালোবাসেন?

আমরা সবাই আল্লাহকে ভালোবাসি, কিন্তু দ্বীনের উপর কেউ চলতে চাই না, ইসলাম মেনে চলাটা আমাদের পছন্দ না, যদিও আমরা সবাই জানি এটাই সত্য দ্বীন।

আমরা সবাই রাসূল (সা.) কে ভালোবাসি কিংবা ভালোবাসার দাবি করি। রাসূলকে নিয়ে নাশিদ শুনে আবেগে আপ্লুত হই, মিলাদে টাকা উড়াই। কিন্তু কেউ

রাসূল (সা.) সুন্নাহ মেনে জীবন যাপন করতে রাজি নই। নীচে বসে খাওয়া, দাড়ি রাখা, সাদাসিধে জীবনযাপন করা? না, না, না, আমাকে দিয়ে এসব হবে না!

আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই, কিন্তু সেজন্য তো দুনিয়া ছাড়তে হবে, মরতে হবে—এটা কেউ চাই না।

এগুলো সত্যিকারের পুরুষের বৈশিষ্ট্য নয়। সত্যিকারের পুরুষ ফ্যান্টাসি নয়, বাস্তবতায় বিশ্বাস করে। তারা যেটা চায়, সেটার জন্য সংগ্রাম করে, সেটা নিয়ে বাঁচে, দায়িত্ব নেয়, স্যাকরিফাইস করে।

ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের কথা

ঈসা (আ.) একবার তাঁর সঙ্গীদের সাথে পথ চলছিলেন। এমন সময় তাঁদের খিদে পেয়ে গেল। তাঁরা এক জায়গায় বসে টাকাপয়সা বের করে একজনকে দায়িত্ব দিলেন—যাও, শহরে গিয়ে খাবার কিনে নিয়ে এসো। সেই ব্যক্তি শহরে খাবার কিনতে গিয়ে টের পেল যে, সর্বসাকুল্যে যত টাকা আছে, তা দিয়ে কেবল তিনটি রুটি ক্রয় করা যাবে। সে ভাবল, এই খাবার যদি আমি ওখানে নিয়ে যাই, সবাই-ই তো ক্ষুধার্ত, আমি তো তেমন কিছু খেতেই পাব না। সে সেখানেই একটি রুটি খেয়ে ফেলল, আর বাকি দুটি নিয়ে ফিরে এলো। ঈসা (আ.) রুটি দেখে বললেন, তৃতীয় রুটিটা কোথায়? লোকটি অবাক হয়ে ভাবল, কী রে! আমি খাওয়ার সময় তো একাই ছিলাম। সে জবাব দিল, আমি তো দুটিই কিনেছি। ঈসা (আ.) আর তর্ক করলেন না।

তারপর আবার তারা পথ চলতে লাগলেন। আবার খাওয়ার সময় হলো। সঙ্গীরা একটি হরিণ শিকার করতে সমর্থ হলেন। সেটাকে রান্না করলেন, খাওয়াদাওয়া শেষ করলেন। খাওয়া শেষে হাড্ডিগুড্ডি ছাড়া কিছু বাকি থাকল না। ঈসা (আ.) সেই লোকটিকে ডাকলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় মুজিযা সংঘটিত হয়ে হরিণটি জীবিত হয়ে গেল। একটি হাড্ডিসার লাশ থেকে একেবারে জলজ্যান্ত প্রাণী। ঈসা (আ.) বললেন, সেই সত্তার কসম যিনি এতে প্রাণ দিলেন, সত্যি করে বলো তৃতীয় রুটিটি কে খেয়েছিল? ওই লোকটি আগে থেকেই চাপে ছিল। সে এবারও বলল, সত্যিই আমি দুটি রুটিই ক্রয় করেছিলাম।

আমরা জীবনে মাঝেমাঝে এমন সব ভুল করি যা প্রথমবারে স্বীকার করে নিলে তেমন কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু আমরা মিথ্যা বলে সেটাকে ঢাকতে চাই, আরো দশটা মিথ্যা বলতে বলতে পরিস্থিতি একেবারে জটিল করে ফেলি। এই ব্যক্তিটি বলে দিতে পারত, দেখেন, আমার খুব খিদে পেয়েছিল। পরে কতটুকু খানা জোটে বা না জোটে ঠিক নেই। তাই আমি ওখানেই একটা খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু তা

না করে এখন সে কতো গভীর বিপদে পড়ে যাচ্ছে দেখুন। চোখের সামনে আল্লাহর ক্ষমতা দেখেও সে স্বীকার করছে না।

যা-ই হোক, ঈসা (আ.) কথা না বাড়িয়ে আবার সঙ্গীদের সহ পথ চলতে শুরু করলেন। তারা একটি নদীর পাড়ে পৌঁছালেন। ওপারে যাওয়ার মতো কোনো নৌকাও নেই, পানির গভীরতাও বেশি। ঈসা (আ.) তাঁর সব সঙ্গীদের জড়ো করলেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় পুরো দলটি পানির পৃষ্ঠের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে একদম অপর পাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। ঈসা (আ.) সেই লোকটিকে আবার ডাকলেন। বললেন, সেই সত্তার কসম যিনি আমাদের পানির উপর দিয়ে হাঁটিয়ে আনলেন, তৃতীয় রুটিটি কে খেয়েছিল? লোকটি এবারও বলল, সত্যিই দুটি রুটি ছিল। তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। শেষ গন্তব্যে পৌঁছার পর ঈসা (আ.) সব সঙ্গীদের নিয়ে বসে তিন স্তূপ মাটি জড়ো করলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় সেগুলো স্বর্ণ হয়ে গেল। ঈসা (আ.) লোকটিকে বললেন, এক স্তূপ তোমার, এক স্তূপ আমার, আর আরেক স্তূপ সেই ব্যক্তির জন্য যে তৃতীয় রুটিটি খেয়েছিল। লোকটি এবার চিৎকার করে উঠল, আমিই তৃতীয় রুটিটি খেয়েছিলাম।

মানুষটি যখন চোখের সামনে দুনিয়াবি সম্পদের হাতছানি দেখল, তখন সহজেই স্বীকার করে নিল। ঈসা (আ.) বললেন, তিনটি স্তূপই তোমার। কিন্তু তুমি আর আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। একথা শুনে লোকটি কী বলল? লোকটি বলল, আরে যান যান! দেখেন আমার নিজের এখন কতো কিছু আছে।

ঈসা (আ.) সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেলেন। আর এদিকে ওই লোকটির তো মাথাই নষ্ট। এত সম্পদ দিয়ে প্রথমে কী কেনা যায়, কী খাওয়া যায় তা ভাবতে ভাবতে অবস্থা খারাপ। একটু পর তিনটি চোর এলো। তিন স্তূপ স্বর্ণ দেখে তারা লোভে পড়ে গেল, লোকটিকে তারা মেরে ফেলল। তিনজন চোর, তিন স্তূপ স্বর্ণ। কিন্তু তাদেরও খিদে লেগেছে। একজন বলল, আমি শহরে যাই, খাবার কিনে আনি। আগে সবাই খাওয়া-দাওয়া করি। এরপর আমরা যে যার অংশ নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। সুন্দর পরিকল্পনা।

যে শহরে যাচ্ছে সে ভাবছে ওই দুইজনের অংশ কীভাবে মেরে দেওয়া যায়। আর ওখানে দুজন ভাবছে তৃতীয়জনের অংশটা কীভাবে মেরে দেওয়া যায়। এরা ঠিক করল তৃতীয়জনকে মেরে ফেলবে, তারপর তার অংশটা নিজেরা আধাআধি ভাগ করে নেবে। ওদিকে খাবার কিনতে যাওয়া চোরটা ভাবছে, ওরা নিশ্চয় আমার কোনো ক্ষতি করবেই। তাই সে খাবারে বিষ মিশিয়ে দিল। সে খাবার নিয়ে ফিরে

আসতে না আসতেই বাকিরা তাকে হত্যা করে ফেলল। তারপর নিজেরা বসে উদরপূর্তি করল। একটু পর খাবারের বিষে তারাও মারা গেল। ঈসা (আ.) ফিরে আসছেন। তাঁরা সেই ফেলে যাওয়া সঙ্গীর লাশ দেখলেন, তিনটি চোরের লাশ দেখলেন, আর তিন স্তূপ স্বর্ণ একেবারে অক্ষত অবস্থায় দেখলেন। ঈসা (আ.) তাঁর সঙ্গীদের বললেন, এই হচ্ছে দুনিয়ার জীবন। যে এর পেছনে দৌড়ায়, দুনিয়া তাকে এই অবস্থা করে ছাড়ে।

এটাই দুনিয়া। আল্লাহর কসম, আপনি যত ইচ্ছা এর পেছনে দৌড়াতে পারেন। কিন্তু আপনি সবই পেছনে ফেলে যাবেন। কিচ্ছু সাথে নিতে পারবেন না। অথচ কতবারই না আমরা এই দুনিয়ার তুচ্ছ মুল্যে নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে দিয়েছি! আর আমাদের মাঝে কেউ ভাবছে, আরে না! আমি একেবারে সাচ্চা ঈমানদার। আমার এমন দুর্ঘটনা হতেই পারে না। ওয়াল্লাহি, শয়তানের চক্রান্ত আমাদের বুদ্ধির চেয়ে অনেক গভীর। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

বিলি—দ্যা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন

বক্সিং ছিল বিলির স্বপ্ন। আর ছোটবেলা থেকেই আর সবার মতো তারও স্বপ্ন ছিল একদিন বক্সিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া। তারপর সত্যি সত্যি যখন সেই স্বপ্ন বাস্তবে ধরা দিল, কেমন ছিল সেই অনুভূতি? বিলির ভাষায়,

> "আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, আমি এখন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন! আমার জন্য এটা ছিল গর্ব করার মতো এক মুহূর্ত। আমি ভাবছিলাম, আমার ছোট ভাই এখন স্কুলে যাবে আর বন্ধুদের গর্ব করে বলবে, জানিস, আমার ভাই এখন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন। বক্সিং রিঙের এক কোণায় চ্যাম্পিয়ন বেল্ট নিয়ে দাঁড়ানো, আর দর্শকদের উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়তে দেখা—এ এক অন্যরকম অনুভূতি।"

দুই দুইবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া সহজ কথা নয়, কিন্তু বিলি সেই অসাধ্য সাধন করেছিল। ছোটবেলা থেকেই বিলি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখত—খ্যাতি কিংবা অর্থকড়ির জন্য নয়, বরং খেলাটাকে সে মনেপ্রাণে ভালোবাসত। বিলির ভাষায়,

> "যখন আমি বক্সিং শুরু করি, তখন আমার কাছে এই খেলাটার মানেই ছিল শুধু ট্রফি আর বেল্ট জেতা। টাকা পয়সার চিন্তা কখনো মাথায় আসেনি।"

কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর পরিস্থিতি পাল্টে গেল। অন্য বক্সিং তারকাদের মতো বিলির চোখ গেল খ্যাতি, বিলাসিতাময় জীবনের দিকে।

> "অস্কার দ্যা লা হোয়ে, শ্যান মোসলেহ, প্রিন্স নাসিম, মাইক টাইসন এদের দেখেই আমি বড় হয়েছি। এদের প্রত্যেকেই বক্সিং খেলে মিলিয়নিয়ার হয়েছে। আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর এখন আমি সেসব লিজেন্ডদের সাথে চলাফেরা করছি। তাদের ফেরারি, ল্যাম্বরগিনি,

মেয়ব্যাকস, রোলস রয়সেস দেখতাম আর ভাবতাম—একদিন আমারও এসব চাই।" —বিলি

"আমেরিকায় ছুটি কাটাতে গিয়ে একবার আমার ফ্লইড ম্যায়ওয়েদারের সাথে দেখা। আমি তাকে বললাম, হে ফ্লইড, আমি তো এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! জবাবে ফ্লইড শুধু বলেছিল, তোমার সাথে আমি যোগাযোগ করব।" —বিলি

এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিলির কাছে আমেরিকায় TMT প্রমোশনে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব আসে। 50 cent আর ফ্লইড ম্যায়ওয়েদার মিলে এই TMT প্রমোশন খুলেছিল যার আরেক নাম 'The Money Team'. TMT প্রমোশনে যোগ দিয়ে বিলির মনে হলো এবার তার জীবনের সব শখ আহ্লাদ বুঝি পূরণ হতে চলেছে। বড় বড় তারকাদের সাথে তাদের ফেরারি, ল্যাম্বরগিনিতে ঘুরাফেরা, ফাইভ স্টার হোটেল, দামি রেস্টুরেন্ট— হঠাৎ করে বিলির জীবনটাই পাল্টে যেতে শুরু করল।

"আমি যখন 50 cent এর সাথে চুক্তি সই করি, তখন মনে মনে চিন্তা করছিলাম, এবার তাহলে একটা ফেরারি, একটা ল্যাম্বরগিনি কিনে ফেলব, এরপর এটা কিনব, ওটা কিনব, এটা করব, ওটা করব ইত্যাদি। টাকা এখনো হাতে আসেনি, তার আগেই আমি মনে মনে শপিং করা শুরু করে দিয়েছি। যখন কোনো দামি গাড়ি চোখে পড়ত, ভাবতাম কালকেই এই গাড়িটা কিনে ফেলব।" —বিলি

কিন্তু বাইরে থেকে বিলির এই জীবনটা যতই রংচঙা মনে হোক না কেন, কিছুদিন যেতে না যেতেই বিলির ভেতরের সত্তা এই জীবনটার অসারতা টের পাওয়া শুরু করল।

"এ লোকগুলোর সাথে থাকা আমার কাছে গজবের মতো মনে হচ্ছিল। 50 cent যে কিনা পৃথিবী বিখ্যাত র‍্যাপার, এরকম মানুষদের সাথে থাকব—এটা আমার কাছে বিশাল এক ব্যাপার মনে হতো। কিন্তু আমেরিকায় গিয়ে সেখানে তারা আমাকে এমন সব কাজ করতে বলত, এমন সব বিষয়ে যুক্ত হতে বলত, যা আমি কখনো করিনি। এমন সব পার্টিতে আমাকে নিয়ে যেত, যেখানে আমি কখনো যাইনি। ধীরে ধীরে আমি তার প্রতি আকর্ষণ হারাতে থাকতাম, সেও আমার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছিল।" —বিলি

একদিকে যখন বিলি এরকম পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত, সেসময় অন্তকোন্দলের কারণে TMT প্রমোশন ভেঙে যায়। আর এসবকিছু ঘটছে ঠিক তখনই, যখন বিলি ম্যাজর ওয়ার্ল্ড টাইটল জেতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"একদিন 50 সেন্ট এসে বলল, শোনো বিলি, আমি তোমাকে যে টাকা দেব বলে চুক্তি করেছিলাম, সেটা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। তারা আমার সাথে এসব করছে আমার ওয়ার্ল্ড টাইটল ম্যাচের ঠিক দুই দিন আগে—যখন আমার মাথায় শুধু ম্যাচের চিন্তা! মনে হচ্ছিল যেন তারা আমার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়েছে। যাই হোক, ম্যাচের দিন আমি ভেন্যুতে যাচ্ছিলাম। কেন জানি না, আমি আমার মা'কে ফোন দিলাম। ফোন দিয়ে বললাম, মা, আমি চাই তুমি আজকে আমার ম্যাচ দেখবে না।" —বিলি

সেই ম্যাচটা বিলি হেরে গেল। হঠাৎ করে হাওয়ায় ভাসতে থাকা বিলির যেন মাটিতে নেমে আসা। যেন ছবির মতো সুন্দর একটা স্বপ্ন হঠাৎ ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে ভেঙে গেল। কিন্তু এই দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা লাগল যখন বাড়িতে এসে বিলি স্ত্রীর ফোন পেল।

"সেই দিনটির কথা আমি কোনোদিনও ভুলব না। আমার এখনো মনে আছে আমি লাউঞ্জরুমে বসে ছিলাম, সামনেই আমার মা দাঁড়িয়ে আছে। সেসময় আমার স্ত্রী সারাহর ফোন এলো।

—কী করছ বিলি?

—কিছু না, এই তো।

—কোথায় তুমি?

—এই তো বাসায়।

—শোন বিলি! আমি তোমাকে একটা খবর জানাতে চাই। আমার ক্যান্সার ধরা পড়েছে।"

কিছু সময়ের জন্য আমার মনে হলো সারাহ আমার সাথে মজা করছে। কিন্তু হঠাৎ সে ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।"

দুই মাস দশ দিন পর বিলির স্ত্রী সারাহ্ তাকে ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। দুঃখ, বেদনা আর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে নাজুক সময়ে বিলি তার প্রিয়তমা স্ত্রীকেও হারাল।

> "এই পুরো অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে কষ্টের অনুভূতি হয়েছিল সারাহর বাবাকে দেখে। নিজের মেয়ে অল্প কয়দিনের মধ্যে মারা যাচ্ছে এটা জেনে তিনি পাগলের মতো ডাক্তারকে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, কী বলছেন আপনি? কী চাই আপনার? টাকা? কত টাকা চাই আপনাদের? কিন্তু ডাক্তার জানাল, টাকার প্রশ্ন না স্যার। আমরা সারাহর জন্য করণীয় সবকিছু করেছি। কিন্তু আমরা দুঃখিত, সারাহ আমাদের সাথে আর খুব বেশিদিন নেই। আমি দূর থেকে এসব শুনছিলাম আর বারবার শুধু একটা প্রশ্নই মাথায় বাজছিল, 'এত টাকাপয়সা কী কাজে এলো'"?
> —বিলি

বিলি কখনো আশা করেনি, তার সাজানো গোছানো জীবনটা এভাবে তছনছ হয়ে যাবে। যে নিয়ামত আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন, মুহূর্তেই আবার আল্লাহ সেগুলো এভাবে ছিনিয়ে নেবেন। কিন্তু এর মাধ্যমেই বিলি জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা পেল।

> "সারাহর মিত্যুর পর মানসিকভাবে আমি এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম, আমার শুধু মনে হতো যদি সময়ের কাঁটা আবার পেছনে ঘুরিয়ে দিতে পারতাম! কারণ আমি এসব আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সারাহর মৃত্যুর পর আমি জীবনে প্রথমবার কোনো কবরস্থানে গিয়েছি। নিজ হাতে সারাহকে কবর দিয়েছি। এরপর থেকে আমি কবরস্থানে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলাম, কখনো দিনে দুই তিন বার করেও যেতাম। কাউকে জানতে দিতাম না আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি শুধু সেখানে যেতাম আর চুপচাপ বসে থাকতাম।"

প্রিয়জন হারানোর এই বেদনার সাথে লড়াই করাটাই ছিল বিলির জীবনের সবচেয়ে বড় লড়াই। আর এর মাধ্যমেই বিলি তার দ্বীন আবার ফিরে পেল। ফিরে পেল আল্লাহর সাথে তার হৃদয়ের সেই সম্পর্ক।

> "যখন সালাত আদায় করি, আমার মনে হয় জীবনে আর কোথাও এমন প্রশান্তি নেই। এসব আমি শুধু বলার জন্যই বলছি না, এটাই সত্য। যখন আমি পেরেশানিতে থাকি, অস্থির বোধ করি, আমি আল্লাহর কাছে গিয়ে

চাই, 'ও আল্লাহ! আমাকে সাহায্য কর। আমার অন্তরের এই দুঃখ বেদনা থেকে আমাকে মুক্তি দাও'।"—বিলি

"আমার বাবা আমাকে সবসময় বলত, মানুষের জীবনের সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। আর দুনিয়ার এই জীবন হলো একটা পরীক্ষা। সারাহর মৃত্যু, বক্সিং রিঙে ম্যাচ হারা—এসবকিছু আমার জন্য পরীক্ষা ছিল। আর এসব পরীক্ষায় আমি কিছু জিনিস হয়তো হারিয়েছি, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান, আমার আল্লাহকে খুঁজে পেয়েছি।" —বিলি

যে বিলির কাছে মনে হতো বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাকে প্রাচুর্য আর সুখশান্তির একটা জীবন দেবে, সেই মোহ একসময় কঠিন বাস্তব হয়ে তার জীবনটা পাল্টে দিল।

সে মনে করত এই ট্রফি, বেল্ট—এগুলোই জীবন। একসময় তাই আল্লাহর কাছে শুধু এসবই সে চাইত। কিন্তু আল্লাহর কাছে এখন তার শুধু একটাই চাওয়া,

"ও আল্লাহ আমাকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখ। আর আমাকে তোমার কাছে কেবল তখনই নিয়ে যেয়ো, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।"

নবিজি যেখানে প্রতিবেশী

আমার দাওয়াহ ক্যারিয়ারে অনেক রকম মানুষের দেখা পেয়েছি। আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম নিয়ে অনেকে অনেককিছু ভাবে। কিছু মানুষ বলে, কোনোমতে জান্নাতে যেতে পারলেই হলো, এতেই তারা খুশি। অথচ জান্নাত শুধু একটি স্তর না। জান্নাতের বেশ কিছু স্তর রয়েছে। একটি থেকে আরেকটি স্তরের মর্যাদা বেশি। তাই যখন কেউ বলে, "ভাইরে! জান্নাতে খালি ঢুকতে পারলেই হলো! তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাব।" — বাস্তবে এ কথা সত্য নয়। দুনিয়ায় কিন্তু আমরা নিজেদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট নই। আপনি যে গাড়িতে চড়েন, সেটা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট নন। আপনার কাছে যে পরিমাণ টাকা আছে, তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট নন। আপনি যে বাড়িতে থাকেন, তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট নন। দুনিয়ায় আপনি সবসময় আকাঙ্ক্ষা করেন যেটা আছে তার থেকে ভালো ও বেশি কিছু পাওয়ার। কিন্তু যখন দ্বীনের কথা আসে, আখিরাতের কথা আসে, তখনই আমরা অল্পে তুষ্ট হয়ে যাওয়ার ভান করি।

আসহাবে সুফফার একজন খুবই গরীব সাহাবি রাবিআ বিন কাব আল আসলামি (রা.)। তিনি আহলুস সুফফার সদস্য ছিলেন। মসজিদে নববির পেছন দিকে একটা অংশ ছিল, যেখানে বসবাসকারীদের আহলুস সুফফা বলা হতো। আহলুস সুফফার সাহাবাগণ ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই কপর্দকশূন্য। আমরা প্রায়ই বলি না যে "হাতে টাকা-পয়সা নাই," "অভাবে আছি" ইত্যাদি? আমাদের বলার অর্থ হলো, "আমার পকেটে বেশি টাকা নেই, কিন্তু বাপের টাকা দিয়ে আরামেই চলছি।" কিন্তু এই আহলুস সুফফার মানুষগুলোর কাছে সত্যি সত্যিই কোনোই টাকা-পয়সা ছিল না। মসজিদে থাকছেন, সতর ঢাকার মতো পোশাক কিনবেন, সেইটুকু আর্থিক সামর্থ্যও নেই। আপনি মসজিদে নববিতে সালাত আদায় করছেন, কিন্তু আপনার সতর ঢাকার মতো সামর্থ্য নেই! ভাবতে পারেন?

আল্লাহর রাসূল তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য যখন ঘর থেকে বের হতেন, রাবিআ বিন কাব আল-আসলামি নবিজির জন্য ওযুর পানি নিয়ে আসতেন। এমনি একদিন রাবিআ ওযুর পানি নিয়ে এলেন। রাসূল (সা.) রাবিআর দিকে তাকালেন। তাঁর গরিবি হালত দেখে নবিজির মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি (সা.) বললেন,

— "রাবিআ, কিছু একটা চাও।"

— "হে আল্লাহ নবি! আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই।"

নবিজি যেন ইঙ্গিতে বোঝাতে চাচ্ছেন, আরে! আমি আখিরাতের কথা বলছি না। এখানে দুনিয়ায় কী চাও? স্ত্রী লাগবে না? অথবা একটা ঘর? বলো, কিছু একটা চাও। রাবিআ নবিজির দিকে তাকিয়ে বললেন,

— "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। আর কিছু না।"

আচ্ছা ভাবুন তো আপনি বিল গেটসের সাথে একটা রুমে বসে কথাবার্তা বলছেন। সে আপনার অবস্থা দেখে দুঃখ পাচ্ছে। তারপর হঠাৎ বলল—"আপনি এই চেকটাতে যেকোনো একটা টাকার পরিমাণ লেখেন তো। আমি সাইন করে দিই।" সেখানে এই তরুণ সাহাবি প্রস্তাব পেলেন স্বয়ং আল্লাহর নবির কাছ থেকে। যে নবি কেবল দুআ করলে, আল্লাহ্ আসমান থেকে স্বর্ণের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে ছাড়তেন, সেই নবি রাবিআকে বলছেন কিছু একটা চাইতে। কিন্তু গরীব এই সাহাবির জীবনে শুধু একটিই চাওয়া—জান্নাতে যেন নবিজির সাথে থাকতে পারেন।

যেখানে আমরা বলি জান্নাতে কোনোরকমে ঢুকতে পারলেই হলো! সেখানে এই মানুষগুলোর চিন্তাভাবনা কেমন ছিল দেখুন। দুনিয়ায় যার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব, অসহায়—সেই মানুষটি আপনার আমার মতো শুধু কোনোমতে জান্নাতে যেতে চান না। তিনি চান জান্নাতে যেন নবিজি তাঁর সঙ্গী হয়।

রাবিআর এই চাওয়া শুনে নবিজি (সা.) বললেন,

— "হে রাবিআ! তুমি বিরাট এক জিনিস চেয়েছ। বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে তোমার এই অনুরোধ পূরণে আমাকে সাহায্য করো।" অর্থাৎ বেশি করে সালাত পড়ো।

আরেকজন সাহাবি একবার নবিজি (সা.) এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যতক্ষণ আপনার সাথে থাকি, ততক্ষণ আমার মন-মেজাজ খুব

ভালো থাকে। আর যখনই ঘরে ফিরে যাই, তখনই আপনাকে মিস করতে শুরু করি। তারপর আমি পরিবারকে ছেড়ে আবার আপনার কাছে ফিরে আসি। আপনার উপর চোখ পড়তেই আমার অন্তরে প্রশান্তি ফিরে আসে। কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় চিন্তা ভর করল যে, একদিন তো আপনি মারা যাবেন, আর আমিও মারা যাব। আর তখন আপনি থাকবেন জান্নাতের উঁচু স্তরে নবিদের সাথে। আর আমি যদি কোনোমতে জান্নাতে যেতে পারিও, আমি তো আর আপনার সমকক্ষ হতে পারব না, জান্নাতে গেলেও হয়তো নিচু কোনো স্তরে থাকব। ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাত কী করে আমার কাছে জান্নাত হবে, যদি সেখানে আপনাকে না পাই?"

সাহাবির কথা শুনে কিছু সময়ের জন্য নবিজি নির্বাক হয়ে গেলেন। আসমান থেকে জিবরিল (আ.) নেমে এলেন। তিনি বললেন, "আপনার উম্মাতকে বলে দিন, তারা যাকে ভালোবাসে, জান্নাতে তাদের সাথেই থাকবে।" আনাস (রা.) বললেন, "আল্লাহর কসম! এই হাদিসটি আমাদের সবথেকে প্রিয়। কারণ আল্লাহর কসম! আমরা রাসূল (সা.), আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবাসতাম না।"

আকাশের ওপারে, অনিন্দ্য সুন্দর জান্নাতে, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকেও একটি করে ঘর বানিয়ে দেন। যে ঘরের পাশেই কোথাও প্রিয় নবিজিও থাকবেন। কোথাও থাকবেন আবু বকর (রা.), কোথাও উমর (রা.)। আমরা সেদিন বলব, দুনিয়াতে আপনাদেরকে আমরা ভালবাসতাম। জান্নাতে এসে একদিন আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।

আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে কবুল করেন। আমীন।

২০ পয়সায় ঈমান বিক্রি

এক ইমামের কাহিনী। তাঁকে এক মসজিদে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার বাসা থেকে মসজিদের দূরত্ব ছিল অনেক। তাই তিনি জুব্বা-পাগড়িসহ ইমামের পোশাক পরে প্রতিদিন বাসে আসা-যাওয়া করতেন। তো যথারীতি একদিন তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন। তিনি বাসের ভাড়া দিলেন। তাঁকে ভাঙতি ফেরত দেওয়া হলো। প্রথমে তিনি খেয়াল করেননি, পরে দেখলেন তাঁকে ২০ সেন্টস বেশি দেওয়া হয়েছে। ২০ সেন্টস এমন কিছুই না। আমাদের ২০ পয়সার মতো। কিন্তু ইমামের মাথায় তখন কথোপকথন শুরু হয়ে গেল। এই ২০ সেন্টস কি তিনি ফেরত দেবেন নাকি দেবেন না, দেবেন নাকি দেবেন না। একবার মনে হচ্ছে ফেরত দেওয়া উচিৎ। আরেকবার মনে হচ্ছে, আরে কী দরকার! ২০ সেন্টস জন্য কী আর এমন হবে। আর এরা এমনিতেই কুফফার। মরুক! কী আসে যায়?

এমনভাবে চলতে চলতে গন্তব্য চলে এলো। তিনি নেমে যাচ্ছেন, নামতে নামতে মাথার মধ্যে ওই কথোপকথন চলছে। হঠাৎ তাঁর কী হলো, তিনি ফিরে বাস ড্রাইভারকে বললেন, তুমি আমাকে ভুলে ২০ সেন্টস বেশি দিয়েছ। সে বলল, না। আমি ইচ্ছা করেই দিয়েছি। আপনাকে অনেক দিন ধরে দেখছি। আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি আপনি কোনো মুসলিম ইমাম। আমি ঠিক করেছিলাম আপনি যদি এই ২০ সেন্টস ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব। আর যদি ফিরিয়ে না দিতেন তাহলে বুঝতাম আপনারাও অন্য সবার মতোই মিথ্যুক। এ ঘটনা বলে সেই ইমাম কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো কাঁদছেন কেন? সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এজন্য? তিনি বললেন, না। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আমি ২০ সেন্টসের বিনিময়ে আল্লাহর দ্বীনকে প্রায় বিক্রি করে ফেলেছিলাম।

একবার আমি (সাজিদ ইসলাম) এক জায়গায় গিয়েছিলাম, অনেক দূর। এমন এক জায়গা যেখানে আমি কাউকে চিনি না, আমাকেও কেউ চেনে না। রাস্তার ধারে এক দোকানে চা খেতে বসেছি। হঠাৎ দোকানি বলল, হুজুর একটু দেইখেন, আমি একটু আসতেছি।

অপরিচিত এক হুজুর ছেলেকে দোকানি তার দোকান দেখার দায়িত্ব দিয়ে চলে গেল। কারণ তার মনের ফিতরাত বলছে, হুজুররা দোকান মেরে চলে যাবে না। ফকির, মিসকিনদের ভিড় লেগে থেকে মসজিদের সামনে। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা বলছে, হুজুররাই দান খয়রাত বেশি করে। বিয়ের সময় পাত্র 'নামাজি' এটা আর যাই হোক একটা ভালো ইম্প্রেশন তো তৈরি করেই।

এভাবে ইসলাম, এর লেবাস এবং এর চর্চা—মূল্যবোধ, নৈতিকতার মানদণ্ডে মানুষকে অন্য দশজন থেকে আলাদা করে দেয়। যাদেরকে আল্লাহ এই বিশ্বাস, আকিদার হিদায়াত দান করেছেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মূল্যবান আমানতও। আমানত এই যে—আপনি আর দশজনের মতো নয়। আপনি যে চুরি করতে পারেন না, ঘুষ খেতে পারেন না, কোনো অন্যায় করতে পারেন না, আপনি যে বিশ্বস্ত, আপনার মূল্যবোধ, নৈতিকতা যে আর দশজন থেকে আলাদা—এটা আপনাকে দেখেই যেন বোঝা যায়। আল্লাহ আমাদেরকে এই আমানত রক্ষার তাওফিক দান করুন। আমীন।

পুরুষেরা যেদিন 'পৌরুষ' হারিয়েছে, নারীরা সেদিন 'হায়া' হারিয়েছে

এক আলিমের ঘটনা। একদিন তিনি শুক্রবারের জুম'আর আগে খুতবা তৈরি করছিলেন। সামনে কিতাবপত্র নিয়ে পড়াশোনা করছেন, নোট করছেন। শাইখের ছেলে সেসময় বাবার পাশে খেলাধুলা করছিল। বারবার বাবাকে ডিস্টার্ব করছিল, শাইখও ছেলের দুষ্টুমিতে কাজে মন দিতে পারছিলেন না। এদিকে জুম'আর সময়ও আর বেশি নেই। তাই তিনি একটা ম্যাগাজিন খুলে সেখানে একটা পৃথিবীর মানচিত্রের ছবি দেখলেন। তিনি ম্যাগাজিন থেকে মানচিত্রটি কেটে নিলেন। সেটাকে এলোমেলোভাবে কয়েক টুকরা করে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, যাও এই মানচিত্রের টুকরাগুলো জোড়া লাগিয়ে আনো, দেখি পারো কি না!

শাইখকে অবাক করে দিয়ে তার ছেলে কয়েক মিনিট পরই মানচিত্রের টুকরাগুলো জায়গামতো বসিয়ে নিয়ে এলো। শাইখ তো অবাক। ছেলের প্রতিভায় রীতিমত মুগ্ধ। তিনি মনে করেছিলেন এই কাজ করতে তার অনেক সময় লেগে যাবে, এই ফাঁকে তিনি নিজের কাজ শেষ করে ফেলবেন। কিন্তু ছেলে তো পুরো ফাটিয়ে দিল। তিনি খুবই কৌতূহল নিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা কীভাবে করলে? ছেলে জবাব দিল,

> আসলে মানচিত্রের পেছনে একটা মানুষের ছবি ছিল। আমি মানচিত্র জোড়া লাগাইনি, মানুষটাকে জোড়া লাগিয়েছি। হাত, পা, মাথা জায়গামতো বসিয়ে দিয়েছি, এতে করে অপর পাশের পৃথিবীর মানচিত্রটাও অটোম্যাটিক জায়গামতো জোড়া লেগে গেছে।

শাইখ মনে মনে ভাবলেন, তিনি আজকের জুমার খুতবার টপিক পেয়ে গেছেন।

> "When the men come together, the world also comes together."

সুতরাং এই ভাঙ্গা পৃথিবীটাকে জোড়া লাগানোর জন্য উম্মাহর 'পৌরুষ' ফিরিয়ে আনা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

আজকাল অনেকে নারীদের বিপথে যাওয়া নিয়ে কথা তোলেন। দেখুন ভাই, মেয়েরা কীভাবে বিপথে যাচ্ছে, পর্দা ছেড়ে দিচ্ছে, ফাহেশা কাজে লিপ্ত হচ্ছে! কিন্তু এটা একদিনে হয়নি। যেসব নারীরা বিপথে যাচ্ছে, তাদের আগে তাদের পুরুষরা বিপথে গেছে। বিপথে যাওয়া নারীরা হায়া হারানোর আগে, এসব নারীদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা পুরুষেরা তাদের হায়া, গীরাহ, পৌরুষ হারিয়েছে।

যে ভাইগুলো বলছে নারীরা বিপথে চলে যাচ্ছে, সেই একই ভাইয়েরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আপলোড দিচ্ছে। সেই ছবি তার হোয়াটসএপের প্রফাইল পিকচার দিচ্ছে। তাই যাদের কাছেই তার ফোন নম্বর আছে, তাদের কাছে এখন তার স্ত্রীর ছবিও আছে। প্রতিদিন তার স্ত্রীর ছবি অন্যরা দেখছে।

এক ভাই একদিন আমার কাছে এলেন তার স্ত্রীকে নিয়ে। হাসতে হাসতে নিজের স্ত্রীকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমি বিব্রত হয়ে কোনোমতে সালাম দিলাম। কিন্তু সেই মহিলা হাসতে হাসতে আমার দিকে হ্যান্ডসেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। আর পাশে তার স্বামী নির্লজ্জের মতো তখনো হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাকে দোষ দেব, পৌরুষহীন এই ভাইকে, নাকি তার স্ত্রীকে?

রাসুল (সা.) বলেছেন, "এমন তিনজন ব্যক্তি আছে, যাদের দিকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কিয়ামাতের দিন তাকাবেন না। তারা হচ্ছে

(১) যে পিতামাতার অবাধ্য,

(২) যে নারী বেশভূষায় পুরুষদের অনুকরণ করে

(৩) দাইয়ুস ব্যক্তি।" (নাসাঈ: ২৫৬২)

এখানে দাইয়ুস হলো সেই পুরুষ, যে তার অধীনস্ত নারীদের (মা, বোন, স্ত্রী) ব্যভিচার, ফাহেশা কাজে বাধা দেয় না। তারা পর্দা করছে না, এটা তার গায়ে লাগে না। তার স্ত্রী পরপুরুষের সাথে হেসে হেসে কথা বলছে, এতে তার গা জ্বলে না। সে এমন ব্যক্তি, যে তার পৌরুষ হারিয়েছে।

এই উম্মাহর একজন রিজাল—উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তখনও পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি। তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) এর কাছে গিয়ে বলছেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে ভালোমন্দ সব ধরনের লোকেরা আসে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীদের পর্দা করার আদেশ দিতেন। বাইরের কেউ উম্মুল মুমিনীদের দেখবে, উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে এটা পছন্দ হচ্ছিল না। ওয়াল্লাহি, স্বয়ং আল্লাহ এরপর পর্দার বিধান নাযিল করে আসমান থেকে কুরআন পাঠালেন (সূরাহ আযযাব এর ৫৩ নং আয়াত)। নবি নয়, উম্মাহর একজন সত্যিকারের রিজাল, একটা মতামত দিয়েছেন, যার সমর্থনে স্বয়ং আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। এমনই ছিল উম্মাহর পুরুষেরা। তারাই ছিল Real man!

এই উমর ইবনুল খাত্তাব এর মৃত্যুর পর, রাসূল (সা.) এবং আবু বকর (রা.) এর পাশে তাকে দাফন করা হয়। উমরের মৃত্যুর আগে আইশা (রা.) যখন নবিজির কবরের কাছে যেতেন, পর্দা করতেন না, কারণ নবিজি (সা.) এবং পিতা আবু বকর (রা.) দুইজনই তাঁর মাহরাম ছিলেন। কিন্তু উমর (রা.) কে যখন সেখানে দাফন করা হয়, এরপর থেকে আইশা (রা.) পর্দা করে কবরের কাছে যেতেন। উমর ইবনুল খাত্তাবের প্রতি মানুষের সমীহ এই পর্যায়ের ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর কবরের কাছে গেলেও একজন সতী নারী পর্দা করে যেত। এরাই ছিল উম্মাহর পুরুষ। এরাই উম্মাহর নারীদের আগলে রেখেছিল।

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি একবার রাসূল (সা.) এর নিকট ছিলাম। উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা (রা.) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম উপস্থিত হলেন। এটি ছিল পর্দা বিধানের পরের ঘটনা। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা তার সামনে থেকে সরে যাও। আমরা বললাম, তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখছেন না! তখন রাসূল (সা.) বললেন, সে অন্ধ ঠিক আছে, কিন্তু তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না?[৪]

আরেকবার তো একজন আলিম আমাকে (Mohammad Hoblos) বলছেন, ভাই! আপনার দাওয়া ভিডিওতে নারীদের আনেন না কেন? আপনার উচিত নারীদেরকেও নিয়ে আসা! আমি বিস্মিত, হতবাক হয়ে চেয়ে আছি, এ কী বলছেন আপনি! আচ্ছা, আপনি মেনে নেবেন আপনার স্ত্রী আমার সাথে বসে খোশগল্প করছে, হাসাহাসি করছে, আর সেটা ভিডিও হচ্ছে, সারা দুনিয়ার মানুষ দেখছে?

[৪] সুনানে আবু দাউদ ৪/৩৬১, হাদিস: ৪১১২; তিরমিযি ৫/১০২, হাদীস: ২৭৭৯; মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৬; শরহুল মুসলিম, নববি ১০/৯৭; ফাতহুল বারী ৯/২৪৮

আমাদের নারীরা 'হায়া' হারানোর আগে উম্মাহর পুরুষরা তাদের হায়া হারিয়েছে। হায়া, এটা কোনো সহজ বিষয় নয়। সমস্ত ইংরেজি ভাষায় এমন কোনো শব্দ নেই, যেটা এই 'হায়া' শব্দটার যথার্থ অর্থ প্রকাশ করতে পারে! ওলামারা বলেন, যার অন্তরে হায়া নেই, তার মরে যাওয়াই শ্রেয়।

নবিজি (সা.) একদিন আইশা (সা.) এর সাথে ছিলেন। বিশ্রাম করছিলেন, তাই একটু রিল্যাক্স ভঙ্গিতে বসা ছিলেন। এতে তার পায়ের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় দরজায় কেউ একজন কড়া নাড়ল। আইশা (সা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আবু বকর (রা.) এসেছেন। রাসূল (সা.) যেভাবে ছিলেন, সেভাবেই থাকলেন, বললেন আবু বকরকে ভেতরে আসতে দাও। আবু বকর ভেতরে এলেন। কিছুক্ষণ পর আবার কেউ দরজায় করা নাড়ল। আইশা (সা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এসেছেন। এবারও রাসূল (সা.) যেভাবে ছিলেন সেভাবেই বসে থাকলেন, উমর (রা.) কে ভেতরে আসতে বললেন। এর কিছু সময় পর আবার কেউ দরকায় কড়া নাড়ল। আইশা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উসমান ইবনু আফফান এসেছেন। রাসূল (সা.) নড়েচড়ে বসলেন, কাপড় ঠিক করলেন, পরিপাটি হয়ে নিলেন, অতঃপর বললেন, এবার উসমানকে আসতে বল।

রাসূল (সা.) এর এই আচরণ দেখে আইশা (রা.) এর একটু কৌতূহল হলো। তাই তাঁরা তিনজন চলে যাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর এলো, উমর এলো, আপনি যেভাবে ছিলেন সেভাবেই বসে থাকলেন, কিন্তু যখন উসমান এলো আপনি এভাবে পরিপাটি হয়ে, গায়ে কাপড় দিয়ে বসলেন কেন? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, আইশা! আমি কি এমন ব্যক্তিকে লজ্জা করব না, যাকে দেখে স্বয়ং ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা পায়!

এরাই হলো উম্মাহর সেই পুরুষ, যাদের অন্তরে হায়া ছিল, গীরাহ ছিল, পৌরুষ ছিল। তাই তাঁরা তাদের অধীনস্ত নারীদের আগলে রাখতে পেরেছেন। উম্মাহকে জুড়ে রাখতে পেরেছেন। আর আজ উম্মাহ তার পুরুষদের হারিয়েছে, সেই সাথে নারীরাও বিপথে চলেছে। এই উম্মাহকে আবার তার আগের অবস্থায় জুড়ে দিতে হলে, আগে এই উম্মাহর পুরুষদের সত্যিকারের 'পুরুষ' হয়ে উঠতে হবে।

এমন জান্নাত—যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত

দুনিয়ায় আপনি যেসব কাজ করেন, সেসব কাজের উৎসাহ যোগায় কিসে? কেন আপনি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কর্মস্থলে যান? কাজের প্রতি ভালোবাসা? না, টাকার প্রতি ভালোবাসা। আপনার জীবন চলতে টাকার দরকার। কাজ করলে টাকা পাবেন—এজন্যই আপনি কাজে যান। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন যান? জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার কারণে? উঁহু। আপনি জানেন পড়াশোনা করলে ভালো চাকরি পাবেন। চাকরি পেলে কী হবে? হ্যাঁ, টাকা হবে। সব ঘুরেফিরে ওই টাকাতেই ফিরে আসে। আচ্ছা তাহলে আমরা সালাত পড়ি কেন? সিয়াম পালন করি কেন? এই ইসলামি বইপত্র পড়ি কেন? মুসলিম হিসেবে আমরা যা করি, তা আসলে কেন করি? এগুলোও টাকার জন্যই। তবে এই টাকা দুনিয়ার টাকা নয়—আখিরাতের টাকা। সেখানকার প্রাইজ হলো জান্নাত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যারা আখিরাতে সফল, তাদের তিনি পুরস্কৃত করবেন। কী দিয়ে পুরস্কৃত করবেন? জান্নাত দিয়ে।

এই যে ইসলামি বই, ওয়াজ মাহফিল এসব করে আমরা আমাদের আত্মিক উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করি, ভালো মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করি, এসব আসলে কেন? এগুলোর পুরস্কারটা কী? কী হবে যদি আপনি পৃথিবীর সেরা মুসলিম হয়ে যান? দ্বীনের বড় দাঈ হয়ে যান? লাভটা কী তাহলে? আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কোনো হৃদয় কল্পনাও করেনি।" সফলকাম মুমিনদের জন্য আল্লাহ এই পুরস্কার প্রস্তুত করেছেন। জান্নাত! জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার—এমন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকে।

সিডনীতে বাড়ির মূল্য নির্ধারিত হয় বিচ থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে। বিচের যত কাছে বাড়ি হবে, এর দাম তত বেশি হবে। বাসা থেকে যদি সমুদ্র দেখা যায়, তাহলে তাকে বলা হয় 'ওয়াটারভিউ হাউজ'। ধুপ করে দাম বেড়ে তখন দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

আর যদি সমুদ্রের একবারে কাছে বাড়ি হয়, মানে বাড়ি আর সমুদ্রের মাঝখানে কেবল সৈকত—সেটাকে সিডনীবাসীরা বলে 'প্রাইম রিয়েল এস্টেট'। আল্লাহ্ বলেননি যে আপনাকে নদীর কাছাকাছি বাড়িঘর দেবেন। বলেছেন যে আপনার পায়ের নিচে, আপনার বাড়ির নিচ দিয়ে, প্রাসাদের নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ এমন পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সেই জান্নাতে আবার একাধিক স্তর রয়েছে। এক স্তরের বাসিন্দারা অপর স্তরের বাসিন্দাদের মতো নয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন আপনি এমিরেটস ফ্লাইটে করে অসলো থেকে সিডনী যাচ্ছেন। আপনি আর আমি একই ফ্লাইটে উঠে সিডনী চলেছি। টেকনিল্যালি, আমি আর আপনি একই বিমানে আছি। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে বসা যাত্রী আর পেছনে বসা যাত্রী কি একইরকম? ইকোনমি ক্লাস, একদম টয়লেটের সাথে। এরকম যাত্রী এয়ারপোর্টে আসলে কী হয়? "হ্যাঁ, কোন ক্লাসে যাচ্ছেন আপনি? বিজনেস, না ইকোনমি?" ইকোনমি শোনার পর তারা বলবে, "ও আচ্ছা, যান ওই বামদিকে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান।" সেই লাইনে দাঁড়িয়ে মনে হবে, "ইয়া আল্লাহ্! এই প্লেন ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু এই লম্বা লাইন মনে হয় শেষ হবে না। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা লাগবে।" আর যারা জবাব দেয় বিজনেস ক্লাস, তাদেরকে বলা হয়, "স্যার/ম্যাডাম, আসুন। এইদিকে আসুন প্লিজ।" আপনার সাথে দুই-তিন কেজি মালামাল থাকলেই ঝামেলা। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস বা বিজনেসের ওরা সর্বনিম্ন পঞ্চাশ কেজি সাথে করে নিয়ে যেতে পারে। এরা কি সমান? তারপর বিমানে ঢোকার পর কী হয়? তারা আপনাকে ফার্স্ট ক্লাস আর বিজনেস ক্লাসের মধ্য দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর বলবে, "ওই টয়লেট পর্যন্ত হাঁটতে থাকেন।" সীটের অবস্থা দেখেন, সামনে টিভি স্ক্রীনের সাইজ দেখেন। অন্তর জ্বলেপুড়ে যাবে। চৌদ্দ ঘণ্টার জার্নি আপনাকে টয়লেটের গন্ধ শুঁকে পার করতে হবে। আর ওই ব্যাটা ফার্স্ট ক্লাসের সীটে আরাম করে শুয়ে ঘুমাবে। অথচ আপনি-আমি কি বড়াই করে বলতে পারি না, "আরে ওই লোকের সাথে একই এমিরেটস ফ্লাইটেই তো যাচ্ছি না"? কিন্তু তুলনা হয়? খাবার আলাদা, সীট আলাদা, আপ্যায়ন আলাদা। দুনিয়াতেই এই অবস্থা, আর আল্লাহ আখিরাতে যাদের আপ্যায়ন করাবেন, তাদের অবস্থা কী? আপনার কি মনে হয় তারা সমান হবে? আল্লাহর কসম, তারা সমান নয়।

জান্নাতে সময়ের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না! আল্লাহ বলেছেন খালিদীনা ফীহা আবাদা—সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, অনন্তকাল ধরে। একশ বছর না, এক হাজার বছর না, এক মিলিয়ন বছর না—আপনি সেখানে থাকবেন অনন্তকাল!

সেখানে আপনি কখনও মরবেন না। ভাবা যায়? বোঝানোর জন্য আলিমগণ একটি উদাহরণ দিয়ে থাকেন। ধরুন এই পুরো আসমান জমিন সরিষা দানা দিয়ে ভর্তি করে ফেলা হলো। তারপর এক হাজার বছর পর পর একটি করে পাখি এসে সেখান থেকে একটি করে দানা নিয়ে যেতে লাগল। পাখিগুলো দানা নিয়ে শেষ করে ফেলবে ,তারপরও আপনি জান্নাতে জীবিত অবস্থায়ই থাকবেন। এটাই হলো খালিদীনা ফীহা আবাদা—অনন্তকালের জীবন। যেখানে মৃত্যুর ভয় নেই ,বার্ধক্য নেই।

এক বুড়ি মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন ,"হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে কি আমার মতো বুড়িদের জন্য জায়গা আছে? রাসূল (সা.) বললেন , "না। জান্নাতে তো বৃদ্ধাদের জন্য কোনো জায়গা নেই।" বুড়ি কাঁদতে শুরু করল। রাসূল (সা.) হেসে দিলেন। হৃদয়কাড়া এক হাসি। তারপর বললেন ,"আল্লাহ্ আপনাকে যৌবন অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং চিরকাল আপনি সে অবস্থায়ই থাকবেন।"

জান্নাতীদের বয়স হবে তেত্রিশের কাছাকাছি। আপনি, আপনার বাবা, আপনার মা, সবার একই বয়স! জান্নাতে আপনি হবেন আপনার পিতা আদম (আ.) এর সমান—প্রায় ত্রিশ মিটার। সেখানে আপনাকে কখনো টয়লেটে যেতে হবে না। বোনেদের জান্নাতে কখনওই আর ঋতুঃস্রাব হবে না। এই প্রাকৃতিক ঘটনার সময় যেসব মানসিক অস্থিরতা আসত, সেসব আর কখনও আসবে না। সে এমন এক জান্নাত, দুনিয়ার কোনো দুঃখকষ্ট, পেরেশানি কাউকে স্পর্শ করবে না—শেষ, সবকিছুর সমাপ্তি। জান্নাতে কখনও অসুস্থ হবেন না, ক্লান্ত হবেন না, ঘুম আসবে না। জান্নাতে আপনি সত্যিকারের সুখের সন্ধান পাবেন। এটিই মুমিনদের জন্য আল্লাহর তৈরিকৃত পুরস্কার। জান্নাতে কোনো সিয়াম রাখা লাগবে না, সালাত পড়া লাগবে না, ওযু করা লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। জান্নাতে আপনি ক্লীন শেইভড থাকবেন।

জান্নাতে আপনি আয়নার দিকে তাকাবেন আর মনে হবে আপনি দুনিয়ার সুন্দরতম সৃষ্টি। দুনিয়ায় সবচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দর মানুষটাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, "আচ্ছা, নিজের মধ্যে কোন দুটি জিনিস আপনি আরেকটু সুন্দর করতে চান বলুন তো!" সে আপনাকে বিশাল একটা লিস্ট ধরিয়ে দেবে। কিন্তু জান্নাতে আপনি আয়নার দিকে তাকাবেন আর আপনার একবারও মনে হবে না কোনো কমতি আছে, কোনো ত্রুটি আছে, এর চেয়ে আর ভালো হওয়া সম্ভব না। সবদিক দিয়ে পার্ফেক্ট। হ্যাঁ, এটা শুধু জান্নাতেই ঘটবে।

জান্নাতে আপনার আশপাশের কিছুই পুরনো হবে না। দুনিয়ায় সবই পুরনো হয়। নিন্টেন্ডো ভিডিও গেইমের কথা মনে আছে? একদম প্রথমটা। আজকের ছেলেপিলেরা ভাববে, "এটা আবার কোন ডাইনোসরের নাম?" আমাদের সময় এটাই ছিল সেরা। তখনকার গেইমাররা এটাকে মনে করত দুনিয়ার বুকে জান্নাত। আমি যখন এটার খবর পেলাম, আমার তো অবস্থা খারাপ। আমার বাবা-মায়ের অত টাকা ছিল না। তাদের ধরে খুব করে বলতে হয়েছিল, "প্লীজ, এটা কিনে দাও। প্লীজ! প্লীজ!" অনেকদিন টাকা জমিয়ে জমিয়ে যখন তারা আমাকে সেটা কিনে দিলেন, তখন তো মনে হলো, "আহ! দুনিয়া আমার হাতের মুঠোয়!" সেই সুখ কয়দিন টিকেছিল জানেন? সুপার নিন্টেন্ডো বের হওয়ার আগ পর্যন্ত। টাকা যোগাড় করতেই যেহেতু অনেক সময় লেগে গিয়েছিল, তাই সুপার নিন্টেন্ডো বের হওয়ার আগে খুব কম সময় পেয়েছিলাম। যেটা আমার মহাসুখের কারণ ছিল, সেটাই আমার দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে এলো। ভাবতে লাগলাম, কী রে, ভাই! আমি এদিকে ডাকান কমপ্লিট করলাম মাত্র। আর ওইদিকে আরেকজন মারিও খেলছে। আল্লাহ্ কসম! আমার জীবন এভাবেই কাটতে লাগল। মা যখন আমাকে সুপার নিন্টেন্ডো কিনে দিলেন, ততদিনে নিন্টেন্ডো সিক্সটি ফোর বেরিয়ে গেল।

এটাই দুনিয়া। সুখপাখি কখনওই ধরা দেয় না। আপনার কেনা প্রথম গাড়িটার কথা মনে আছে? আমি প্রথম যেই গাড়িটা কিনেছিলাম, সেটা ছিল পৃথিবীর বুকে জঞ্জালের মতো, এই গাড়ি তখন কেউ কেনে না। কিন্তু সেসময় আমি ওটাকে ল্যাম্বরগিনির মতো ভাব নিয়ে চালাতাম। নিজেকে নায়ক ভাবতাম। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আপনি আমি আমাদের গাড়ি আপগ্রেড করেই চলেছি, করেই চলেছি। সুখ খুঁজে পেয়েছেন? আপনার প্রথম ফোনের কথা মনে আছে? কতদিন ধরে আপনি ফোন আপগ্রেড করে চলেছেন? এমনকি প্রথম আইফোনটার কথাও কি মনে আছে? আইফোন থ্রি, আইফোন ফোর, আইফোন ফোর এস? আমার কাছে মনে হতো এটার অর্থ মনে হয় 'আইফোন ফোর স্টুপিড'। একই জিনিস, খালি নামের সাথে একটা এস লাগিয়ে দিয়ে বের করেছে। কিন্তু ওই একটা এস থাকার কারণেই আপনার মন দুঃখে ভরে যাবে, "হায় হায়! এটা বাদ দিয়ে এখনও আইফোন ফোর কেন চালাচ্ছি?"

কিন্তু জান্নাতে ঠিক বিপরীত। জান্নাতে ফল খেতে ইচ্ছে হলে ফলই আপনার কাছে চলে আসবে। ফলে প্রথম কামড়টা বসানোর সাথে সাথে মনে হবে আপনার জীবনে পাওয়া সেরা স্বাদ। দ্বিতীয় কামড় বসাবেন, সেটা প্রথম কামড়ের চেয়ে ভালো মনে হবে। অনন্তকাল ধরে আপনি সেই প্রথম কামড়ের স্বাদ আর পাবেন

না। প্রতিটা কামড়ের সাথে এটি আগের চেয়ে ভালো হতেই থাকবে, হতেই থাকবে, হতেই থাকবে।

জান্নাতে যখন আপনি প্রথমবার আপনার স্ত্রীকে দেখবেন, আপনি এত অভিভূত হয়ে যাবেন যে ওখানেই চল্লিশ বছর কেটে যাবে। হা করে চল্লিশ বছর তাকিয়ে থাকার পর একটু অন্যদিকে ফিরে আবার তার দিকে তাকাবেন। সে এতক্ষণে আগের চেয়েও সুন্দরী হয়ে গেছে। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারীর দিকেও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর কোনো না কোনো ত্রুটি চোখে পড়বে, মনে হবে, "আচ্ছা, এর নাকটা কি একটু বাঁকা?" কিন্তু জান্নাতে এরকম হবে না, সেখানে যতই দেখবেন সৌন্দর্য বাড়তেই থাকবে।

দুনিয়ার স্ত্রী যদি জান্নাতেও আপনার সঙ্গী হয়, রাসূল (সা) বলেছেন যে, হুরদের তুলনায় তার সৌন্দর্য হবে মোমবাতির তুলনায় সূর্যের আলোর মতো—অতুলনীয়। এইসব আল্লাহ আপনার জন্য তৈরি করে রেখেছেন। সেখানে আপনার তাঁবু তৈরি হবে একটি মুক্তা থেকে, ষাট মাইল লম্বা, ষাট মাইল প্রশস্ত। জান্নাতে আপনার প্রাসাদের ইটগুলো হবে সোনা আর রূপার। সেগুলোর গাঁথুনির মসলা হবে কস্তুরীর তৈরি।

এসব জান্নাতে থাকবে আপনার জন্য। যদি আপনি এই দুনিয়ায় অল্প সময়ের জন্য ধৈর্য ধরতে পারেন। কিন্তু জান্নাতের সবচেয় আকর্ষণীয় ব্যাপারটি কী জানেন? আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে জড়ো করবেন এবং আমাদের সাথে কথা বলবেন। সহিহ্ হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা কি আর কিছু চাও আমার কাছে?" আমরা বলব, "হে আল্লাহ! আপনি তো আমাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়েছেন। আমাদেরকে আপনার জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। এসব নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা আর কী চাইতে পারি?" আল্লাহ বলবেন, "তোমরা কি সন্তুষ্ট?" আমর বলব, "হে আল্লাহ! অবশ্যই আমরা সন্তুষ্ট।" আল্লাহ্ বলবেন, "তাহলে এখন থেকে নিয়ে আর কখনওই আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।" আল্লাহ বলবেন, আমি আমার ও তোমাদের মধ্য থেকে পর্দা সরিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা আমাকে দেখতে পাও। আর আপনি স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে শুরু করবেন। আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন! ভাবা যায়? সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সত্যিই আমরা আল্লাহ্কে দেখতে পাব? রাসূল (সা.) পূর্ণিমার চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন, তোমরা কি এই চাঁদটি দেখতে পাচ্ছ? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন, চাঁদকে যেমন কোনো বাধাবিঘ্ন

ছাড়াই দেখতে পাচ্ছ, আল্লাহকেও সেভাবেই দেখতে পাবে। এটি হলো জান্নাতের চূড়ান্ত পুরস্কার।

দুনিয়ার এই পঞ্চাশ-ষাট বছর কিচ্ছু নয়। ধৈর্য ধরে যদি দ্বীন আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেন, আল্লাহ আপনার জন্য এরচেয়ে ভালো কিছু রেখেছেন। কিন্তু এর জন্য আপনাদেরকে সেই জান্নাতের মূল্য চুকাতে হবে। দুনিয়াতে যে ফেরারি গাড়িতে চড়ে, সে কি এটার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেনি? যে বিরাট ম্যানশনে থাকে, সে কি কঠোর পরিশ্রম করেনি? তেমনি জান্নাত পেতে হলেও আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কেউ কেউ বলে, "ভাই, আমার সেই পরিমাণ পরিশ্রমের স্ট্যামিনা নেই।" আমি বলি, এমন মনে হলে তখন স্মরণ করবেন আপনার লক্ষ্য কী। আপনি সেই মানুষদের মধ্যে থাকতে চান, যারা জান্নাতে চিরকাল থাকবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে জীবনটাকে হেলায় হারাবেন না। আখিরাতে আল্লাহ বান্দাদের বলবেন, কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো আর জান্নাতের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উঠতে থাকো। শেষ যে আয়াত তিলাওয়াত করবে, সেটাই হবে জান্নাতে তোমার স্থান। তাই কুরআন শিক্ষা করা কখনওই ছেড়ে দেবেন না। প্রতিটা আয়াত মুখস্থ করার সাথে সাথে আপনি জান্নাতে নিজের মর্যাদা উন্নীত করছেন। আখিরাতে মনে হবে, ইশ! আর একটা আয়াত জানলেই আমি আজকে ওই অবস্থায় থাকতাম! এতশত ইসলামি বই পড়ে আর ওয়াজ শুনে আপনার অ্যাকশান প্ল্যান এখন কী হবে? এগুলোকে জাস্ট বিনোদন হিসেবে নিয়ে যেমন-তেমন চলাফেরা করতে থাকবেন? নাকি অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেবেন জান্নাতে রাসূলুল্লাহর সাথে ফার্স্ট ক্লাস চেয়ারের যাত্রী হওয়ার? সিদ্ধান্ত আপনার।

মূসা (আ.) ও এক গুনাহগার

আল্লাহ যখন আমাদের প্রতি কোনো আচরণ করেন, উম্মাহ হিসেবে আচরণ করেন, আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে না। আল্লাহর বরকত যখন আসে, কার উপর আসে? সবার উপর। আল্লাহর আযাব যখন আসে, সেটাও আসে সবার উপর! এটাই আল্লাহর সিস্টেম। আল্লাহর রহমত নাযিল হলে সবাই সেখান থেকে উপকৃত হতে পারে। তেমনি, আল্লাহর গযব নাযিল হলে সবাইকেই তা ভোগ করতে হয়।

মূসা (আ.) এর জাতির উপর একবার দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করা হলো। মূসা (আ), যিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁর জাতির উপর নেমে এলো ভবায়হ এক দুর্ভিক্ষ! জাতির প্রত্যেকে কষ্ট ভোগ করছে। পানি নেই, খাবার নেই, ফসল নেই, পশু মরছে, মানুষ মরছে। অথচ তাদের মাঝে একজন নবি রয়েছেন। মানুষ তাঁর কাছে এসে জানতে চাইল, হে মূসা! এসব কী হচ্ছে? মূসা (আ.) তাঁর জাতির লোকদের নিয়ে খোলা ময়দানে গেলেন। দুআ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার জাতির কী অবস্থা। আমরা বৃষ্টির জন্য অনুনয় করছি। একজন নবি দুআ করলে স্বভাবতই আল্লাহর উত্তর কী হয়? তিনি তা কবুল করেন। সবাই অপেক্ষা করছে এই বুঝি বৃষ্টি আসলো, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না! আল্লাহর একজন নবি, অনুনয় বিনয় করে সবাইকে নিয়ে দু'আ করছেন, কিন্তু দুআর কোনো উত্তর নেই! ভাবতে পারেন!

মূসা (আ.) ভাবছেন, ইয়া আল্লাহ! এ কী হলো? আমি বৃষ্টির জন্য দুআ করলাম, অথচ কোনো বৃষ্টি নেই! আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব এলো, হে মূসা! তোমার জাতির মধ্যে একজন গুনাহগার আছে।

মূসা (আ.) লোকেদের দিকে ঘুরে বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন গুনাহগার আছে। সে সামনে বেরিয়ে এসো। ওই ব্যক্তি মনে মনে অনুতপ্ত হলো, তাওবা করল। কিন্তু মূসা (আ.) এর সামনে বেরিয়ে এসে পরিচয় দিল না। মূসা (আ.)

অপেক্ষা করছেন, কেউ আসে না। তিনি ফিরে গিয়ে আবার আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। এবার তাঁকে অবাক করে দিয়ে বৃষ্টি নেমে এলো! মূসা (আ.) খুশি, কিন্তু সেই সাথে অবাক। ইয়া আল্লাহ্! এটার ব্যাখ্যা কী? প্রথমবার বৃষ্টি চাইলাম, বলা হলো একজন গুনাহগার আছে। গুনাহগারকে ডাকলাম, কেউ এলো না। আবার দুআ করলাম, বৃষ্টি চলে এলো! ব্যাপারটা কী? আল্লাহ জানালেন, ওই এক ব্যক্তির কারণে আমি বৃষ্টি আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু সে তাওবা করেছে, আমার কাছে মাফ চেয়েছে। আমি তার তাওবা কবুল করেছি। এবং সেই একজন ব্যক্তির তাওবার কারণেই এখন আমি বৃষ্টি দান করলাম। মূসা (আ.) এর খুব আগ্রহবোধ হলো। হে আল্লাহ্! এই লোকটি কে? আমাকে তার পরিচয় জানান। আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! সে যখন গুনাহগার ছিল, তখনই আমি তাকে প্রকাশ করে দেইনি। আর এখন যখন সে আমার কাছে খালেসভাবে তাওবা করেছে, এখন কী করে আমি তাকে প্রকাশ করে দেই?

আমরা এই কাহিনী পড়ার পর ভাবি, আরে কী অসাধারণ কাহিনী! বৃষ্টি চলে এলো। তারপর তারা সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু বৃষ্টি আসাটা এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, সেই লোকটি নিজের গুনাহ্ স্বীকার করার মতো যথেষ্ট সাহসী ছিল, তাওবা করার মতো যথেষ্ট হিম্মত তার ছিল। যেই গুণ আজ আমাদের বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে নেই। আমাদের শহরে আজ কত গুনাহগার, কত মুসলিম বেনামাজি, আমাদের কত বোন বেপর্দা, আমাদের কত মুরুব্বি সূরাহ ফাতিহা পড়তে জানে না! শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির পাপের কারণে আল্লাহ একজন নবির উপর, নবির পুরো একটি জাতির উপর, মৃত্যুপথযাত্রী, নিরীহ নারী, শিশু, পশু, ফসলের উপর বৃষ্টি দেননি! শুধু এক ব্যক্তির গুনাহের কারণে! তাহলে আজ আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত?

কয়জন আমরা আজ সাহস করে উম্মাহর দুর্দশার জন্য নিজেকে দায়ী করতে পারব? বলতে পারব যে এইসব আমার গোপনে করা গুনাহের ফল। আমার জিহ্বার ফল—যাকে আমি চুপ রাখতে পারিনি, আমার দৃষ্টির ফল—যাকে আমি অবনত রাখতে পারিনি? কিন্তু না! আমরা নিজেকে ছাড়া বাকি সবার দিকে আঙুল তুলি। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন,

> "আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরাহ রা'দ, ১৩:১১)

এখনও আপনি এই কথাগুলো পড়ে নিজের পাশে বসা লোকটির কী কী পরিবর্তন হওয়া দরকার, তা ভাবছেন। এখনও আপনি নিজের কথা ভাবছেন না। আপনি যত গুনাহ্ করেন, তার সরাসরি প্রভাব খালি উম্মাহর উপরেই পড়ে না, আপনার উপরও পড়ে। আপনার দ্বীনের অভাব, আপনার বুঝের অভাব, আপনার সালাত ত্যাগ, আপনার করা প্রতিটা হারামের প্রভাব আপনার সন্তানের উপর পড়ে, আপনার বাবা-মায়ের উপর পড়ে, পুরো উম্মাতের উপর পড়ে।

এটা উল্টোদিক থেকেও সত্য। আপনি যখন কোনো নেক আমল করেন, এতে একা আপনারই উপকার হয় না। পুরো উম্মাতের উপকার হয়। আমাদের যাদের অন্তরে তাওহিদ আছে, আমরা সবাই ইসলামের ব্যানারের অধীনে পড়ি, মুসলিম পরিচয়ের ভেতরে পড়ি। রাসূল (সা.) উম্মাত বোঝাতে বলেননি যে, তারা একটি পরিবারের মতো। কেননা, এমনকি পরিবারের মধ্যেও আপনি ভাইয়ের সাথে বা মায়ের সাথে কথা না বলে থাকতে পারেন। যদিও এসব হারাম, কিন্তু আপনার সেটা করার ক্ষমতা তো আছে। আপনি সন্তানের দেখাশোনা না করতে পারেন, তাদের ত্যাজ্য করতে পারেন। কিন্তু আপনি কি আপনার হাতের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবেন, এই জিনিসটা ভালো দেখাচ্ছে না, কেটে ফেলি এটা? না, পারবেন না। কারণ এটা আপনার অংশ, আপনাকে এটা নিয়ে বাঁচতে হবে। তাই নবিজি উম্মাতের উদাহরণ দেওয়ার সময় একে একটা দেহের সাথে তুলনা করেছেন, আপনি যার কাছ থেকে নিজেকে কখনো আলাদা করতে পারবেন না!

মাতাউল গুরুর

পশ্চিমের দেশগুলোতে অনেক মেরুদণ্ডহীন মানুষ আছে যারা নিজের স্ত্রীকে বিধবা ভাতা নিতে পাঠায়! পাঠানোর সময়ও তাকে হয়তো বোরকা, হিজাব, এমনকি নিকাব পরিয়ে পাঠাচ্ছে। তার কোলে এক বাচ্চা, কাঁধে এক বাচ্চা। কেন তাকে এসব করতে পাঠাই? সপ্তাহ শেষে দুটো টাকা পাওয়া যায় বলে। গাড়ি কিনে সেটার দাম কমিয়ে বলছি ট্যাক্স কম দেওয়ার জন্য। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনি এত নীচে নামতেই পারেন না, এসব আপনি কোনোদিনও করবেন না, কিন্তু শয়তান নানা রূপে আসে। দাড়িওয়ালা মুসলিম! মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কাগজে সই করছে! দুইটা টাকা বাঁচানোর জন্য। দুনিয়া কখন যে কাকে পাল্টে দেয়, বদলে দেয়, নীচে নামিয়ে দেয়—তার কোনো ঠিক নেই।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, যিনি দুনিয়ার স্রষ্টা, তিনি যে কারো চেয়ে এই দুনিয়াতে বেশি ভালোমতো চেনেন। সেই আল্লাহ এই দুনিয়াকে বলেছেন—দুনিয়ার হায়াত হলো *মাতাউল গুরুর।*

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"দুনিয়ার জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।" (সূরাহ হাদীদ, ৫৭: ২০)

মাতাউল গুরুরের (مَتَاعُ الْغُرُورِ) একটি অর্থ হলো নারীরা ঋতুস্রাবের সময় যেই ত্যানাটা ট্র্যাম্পন হিসেবে ব্যবহার করে, সেটি। শুধু তা-ই না, একেবারে ব্যবহৃত হওয়া ত্যানা। মানে তাতে মাসিকের রক্ত লেগে আছে, ফেলে দেওয়া হবে, কারো কোনো কাজে লাগবে না সেই জিনিস। আল্লাহ বলেছেন এটাই হলো দুনিয়া। স্বয়ং আল্লাহ দুনিয়াকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অথচ আমরা সেই দুনিয়ার পেছনে দৌড়ে মরছি। রাতদিন খাটছি। দিনে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা ডিউটি করছি এই ব্যবহৃত ট্র্যাম্পনের জন্য। আমরা এর জন্য পাগল হয়ে গেছি। প্রকাশ্য দিবালোকে এক

মুসলিম আরেক মুসলিমের রক্ত ঝরাচ্ছে। কেন? ব্যবহৃত ট্র্যাম্পনের জন্য। আমরা আমাদের দ্বীন বিক্রি করে দিয়েছি।

যে কোনো মসজিদে ফজরের সময় গিয়ে দেখুন, কয়জন মানুষ দুনিয়ার উপর আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছে। একদিন জুমু'আর সময় যান, তার পরদিন ফজরের সময় যান। সেই একই জনগোষ্ঠীকে আপনি জিজ্ঞেস করেন, ভাই, দ্বীন নাকি দুনিয়া? উত্তর দেবে, আস্তাগফিরুল্লাহ! ভাই আপনি কি আমাকে কাফির মনে করেন? অবশ্যই দ্বীন! আল্লাহ আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাশাআল্লাহ, ভালো। কিন্তু আল্লাহ কথা চান না, কাজ চান। কথাই যদি হিসাব করা হতো, তাহলে সবাইই আমরা আউলিয়া, জান্নাতে চলে যেতাম। কিন্তু আল্লাহ চান আমল। কারণ কথার চেয়ে কাজের স্বর অনেক উঁচু। এই যে মানুষগুলো বলছে তারা আল্লাহকে আর-রাযযাক বলে মানে, আল্লাহই দেন, আল্লাহই কেড়ে নেন—তারাই ফজরের সময় নাক ডেকে ঘুমায়। কিন্তু যেই না বাজল ৬টা, অমনি সে কাজে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল। বলছি না এটা হারাম। কিন্তু আপনি কোনটি বেছে নিলেন? দ্বীন, না দুনিয়া? ফজরের সময় নেই, কিন্তু বস যদি বলে রাত তিনটায় অফিসে হাজিরা দেবেন, একজনেরও মিস হবে না। কী বেছে নিলাম তাহলে? আপনিই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আসলেই আপনি দ্বীন নিলেন, না দুনিয়া।

রাসূল (সা.) এই দুনিয়ার বাস্তবতা জানতেন। তিনি দুনিয়াকে ঘৃণা করতে শেখাননি। তিনি এর বাস্তবতা খোলাসা করে দেখিয়ে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে দুনিয়ার কাছ থেকে যথেষ্ট উপকার গ্রহণ করে বাকিটা ত্যাগ করতে হয়। তিনি হাদিসে বলেছেন, এই দুনিয়া অভিশপ্ত। এতে কোনো কল্যাণ নেই। তিনি আরো বলেছেন, এর মধ্যে যা আছে তাও অভিশপ্ত। শুধু আল্লাহর স্মরণ, ইলম অর্জন ও ইলম শিক্ষাদান ছাড়া। আর এর সাথে জড়িত সবকিছু ছাড়া। এই দুনিয়া আসলে কী! আপনি এখান থেকে কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবেন না। এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আজ আপনি এখানে, কাল আপনি নেই। এটাই সত্যি।

অতীতের এক রাজা তার পারিষদকে বলেছিলেন, আমি মরার পর আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় কবর দেবে আর আমার হাত দুটো কবর থেকে বের করে রাখবে। সবাই শুনে অবাক হলো। আচ্ছা উলঙ্গ কবর দেওয়ার বিষয়টা বুঝলাম। কিন্তু হাত বের করে রাখাটা কেন? তিনি বললেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এই রাজা দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় একেবারে খালি হাতে যেতে বাধ্য হয়েছে।

হারুনুর রশীদ ছিলেন এই উম্মাহর একজন মহান শাসক। তিনি পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জয় করেছিলেন। একদিন তিনি এক আলিমের সাথে বসা ছিলেন। তখন বললেন, এই দেখুন, আমরা কত কী করে ফেলেছি। সেই আলিম বললেন, আপনার অধীনে যা কিছু আছে, সেগুলোর বাস্তবতা কী জানেন? খলিফা বললেন, না তো! আলিম বললেন, ধরুন আপনাকে আমি বাসায় দাওয়াত দিলাম। তারপর এক গাদা লবণাক্ত খাবার খেতে দিলাম। আপনার প্রচণ্ড তেষ্টা পেল। আমার কাছে থাকা এক কাপ পানি ছাড়া আর কোথাও কোনো পানি নেই। আপনি সেই পানি নেওয়ার বিনিময়ে আমাকে কী দিতে পারবেন? খলিফা বললেন, আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেব। আলিম বললেন, এরপর ধরুন আপনার খুব প্রশ্রাবের বেগ পেল। একেবারে পেট ফেটে যাওয়ার অবস্থা। আমিই একমাত্র আপনাকে টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারব। এই পরিস্থিতিতে আপনি কী করবেন? খলিফা বললেন, আমি বাকি অর্ধেক রাজত্বও আপনাকে দিয়ে দেব। আলিম বললেন, এই হলো আপনার ও আপনার সব সম্পদের বাস্তবতা—যা এক কাপ পানি আর কিছু মূত্রের মূল্যের সমান।

এটাই দুনিয়ার বাস্তবতা—মাতাউল গুরুর!

❀

আমিই দায়ী—চাই এমন সরল স্বীকারোক্তি

একসময় কিছু বিষয় ছিল যা আমরা সবাই জানতাম, ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল। মানুষ সেগুলো নিয়ে তর্কাতর্কি করত না। যেমন- একটা সময় কোনো লোক মোটা হলে সে কেন মোটা সেটা সবাই জানত। এ নিয়ে কারো কোনো সংশয় ছিল না, কেউ সেটা নিয়ে তর্কও করত না। লোকটা কেন মোটা? খুব সিম্পল, হয় সে বেশি খায়, হয় শরীর চর্চা করে না, হয়তো ভুল সময়ে খায়। এটা সবাই জানে, সাধারণ জ্ঞানের মতো। মানুষ আলোচনা সভা করে বসে তাত্ত্বিক আলোচনা জুড়ে দিত না কেন লোকটা মোটা হলো।

কিন্তু এখন যুগ পাল্টেছে। একজন মানুষ কেন মোটা, এর কারণ সে নয়, বাকি সবাই, বাকি সবকিছু। এক ব্যক্তির বিয়ের সময় ওজন ছিল ৯০ কেজি, বিয়ের পর তার ওজন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩০ কেজিতে। এখন এজন্য কি সে নিজেকে দায়ী না করে অন্য সবার দিকে আঙুল তুলবে? স্ত্রী, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, অমুক তমুক জায়াগায় ভ্রমণ, এটা ওটা করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু যত অজুহাতই দাঁড় করান না কেন, বাস্তবতা হলো, সত্য হলো—আপনি মোটা হয়েছেন আপনার নিজের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। অন্য কারো কারণে নয়।

এক মোটা লোক ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার চেকআপ করে রিপোর্ট দিল। কিন্তু মোটা লোকটা বলল,

—“আরে ডাক্তার সাহেব, মুটিয়ে যাওয়া আমাদের বংশগত রোগ।

—ডাক্তার বলল, হ্যাঁ, এটা বংশগত রোগ! আর আপনার বংশের সবার রোগ হলো এই যে—আপনারা কেউ দৌড়াদৌড়িই করেন না।

আজকাল আমাদের মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো কিছুর দায় না নেওয়া। যা কিছুই হবে হোক, সব অন্যের দোষ, নিজের কোনো দোষ নেই। এমন কোনো মানুষ নেই, যে হাত তুলে বলতে পারে—আমি এর দায় নিচ্ছি। আজ আমরা

দ্বীনের কাছে যাই না, দ্বীনকে আমাদের কাছে আনতে হয়। মসজিদে গিয়ে পাঁচ মিনিট বসে থাকলে মানুষ হাঁসফাঁস করতে থাকে। কোনো আলিমের লেকচার শুনবেন, আরে ধুর এত টাইম কোথায়! আজকালকার ট্রেন্ড হলো সাত মিনিটের বেশি ভিডিও ক্লিপ কেউ দেখে না। এর চেয়ে লম্বা হলেই, ধুর! বেশি লম্বা! খুব বোরিং! আমি কুরআন শিখতে চাই, কিন্তু এর জন্য সময় দিতে চাই না। শর্টকাট খুঁজি, অনলাইনে দ্রুত শেখার মতো জিনিস খুঁজি। একটা সময় সবাই জানত যে স্বাস্থ্যবান হতে হলে ভালো খাওয়া দাওয়া করতে হবে, জিমে যেতে হবে, ডাম্বল তুলতে হবে, বেঞ্চপ্রেস মারতে হবে, নিয়ম মেনে জীবনে চলতে হবে। জনৈক ব্যক্তিকে দেখতাম কাঠির মতো শুকনো। যেন বাতাস আসলে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সে দুই-তিন সপ্তাহের জন্য উধাও। ফিরে আসার পর দেখি সে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে এসেছে। কী ব্যাপার? এত স্বাস্থ্যবান হলে কীভাবে? এই তো, টুনামাছ আর আলু খেয়ে। অথচ তার শরীরে, মুখে স্টেরয়েডের ছাপ স্পষ্ট। সে ভাব ধরছে যে টুনা মাছ আর আলু খেয়ে তার এই অবস্থা।

আমাদের দ্বীনেরও এই অবস্থা, আমরাও এই লোকটির মত শর্টকার্ট খুঁজি। আপনি যখন দ্বীনের মধ্যে শর্টকাট খুঁজবেন, তখন স্টেরয়েডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করবে। আমরা যারা এ যুগে বাস করি, উম্মাহর অবস্থা সম্পর্কে জানি, আমরা কি উম্মাহর আজকের এই অবস্থার উপর সন্তুষ্ট? কে দায়ী এ অবস্থার জন্য? এ কথা জিজ্ঞেস করলে প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে একশ-দেড়শ দায়ী ব্যক্তির নাম বলবে, যারা উম্মাহর দুরবস্থার জন্য দায়ী। কিন্তু একজনও এর মধ্যে নিজের নামটা রাখবে না। আলিমদের এই দোষ, মসজিদ কমিটির এই দোষ, সমাজের ওই সমস্যা, এরা বেশি সেকেলে, আমাদেরকে এটা করতে দেয় না, ওটা করতে দেয় না! কিন্তু কারো এইটুকু ঈমান নেই যে সাহস করে বলতে পারে উম্মাহর আজকের দুর্দশার জন্য দায়ী আমার মতো মানুষেরা। দায়িত্ববোধ আজকে আমাদের কারো মধ্যে নেই। আমরা নপুংসক হয়ে গেছি। অথচ এই উম্মাহর মানুষগুলোর মধ্যে একসময় পৌরুষ ছিল। সত্যের মুখোমুখি হওয়ার মতো যথেষ্ট সাহসী ছিলাম আমরা।

এক ব্যক্তি আলি ইবনু আবি তালিব (রা.)-এর কাছে এলো। তার উদ্দেশ্য হলো আলিকে বিদ্রূপ করা। সে আলি (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা এমনটা কেন হচ্ছে বলুন তো! উমরের যুগ ছিল স্বর্ণযুগ। ইসলাম চারদিকে প্রসারিত হচ্ছিল, মুসলিমরা ধনে-মালে ভরপুর হয়ে উঠছিল। আপনার সময় কেন চারিদিকে এত ফিতনা? আলি (রা.) জবাবে বললেন, “কারণ উমর ইবনুল খাত্তাবের সময় তার

সাথে আমার মতো লোকেরা ছিল। আর আজকে আমার শাসনামলে আমার সাথে আছে তোমার মতো লোকেরা।"

রাসূল (সা.) বলেছিলেন, উম্মাতের উপমা হলো একটি দেহের মতো। এই উম্মাহ একটি দেহ। এই দেহের একটি অঙ্গ যদি ব্যথা পায়, তাহলে সারা দেহ তা অনুভব করে। সারাদেহ নির্ঘুম থাকে। কেন? এই ব্যথাকে, এই ইনফেকশানকে মোকাবেলা করার জন্য। আজ কি আমরা সত্যিই অনুভব করি যে আমরা এক দেহ? আমরা কি উম্মাহর এই দুর্দশা নিয়ে চিন্তিত?

আপনি কি আসলেই এই দেহের একটি অংশ হিসেবে কোনো দায়িত্ববোধ রাখেন? উম্মাহর কী হচ্ছে তা বাদ দিন, আমাদের নিজেদেরই বা কী অবস্থা? ঈমান ও তাওহিদওয়ালা প্রতিটা মানুষের উপর আপনার প্রতিটা গুনাহের সরাসরি প্রভাব পড়ে। সিরিয়ায় যে বোনটি ধর্ষিত হচ্ছে, এইখানে বসে করা আপনার প্রতিটা গুনাহের সরাসরি প্রভাব তার উপর পড়ছে। যেইদিন আপনি পড়েছেন *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ,* সেদিন আপনি ইসলামে প্রবেশ করেছেন। সেদিন থেকে আপনি উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। সেদিন থেকে আপনি এই দেহের অংশ হয়ে গেছেন। তাই আপনি যা করেন, দেহের উপর তার প্রভাব পড়ে।

আজকে এইসব বাস্তবতার মুখোমুখি আমরা হতে চাই না। বাসায় গিয়ে টিভিটা অন করে তাতে হারিয়ে যেতে পারলেই হলো। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এই রোগটা আছে। আরে আমার সালাত হয়তো সুন্দর না, কুরআন পড়ায় হয়তো ত্রুটি আছে, এই ওই গুনাহ আমার দ্বারা হয়, তাতে কী! আমি তো আর কারো ক্ষতি করছি না। এমন কথা অনেককে বলতে শোনা যায়! আবার কেউবা বলে, ভাই, আমি নামাজ পড়ি না, এতে আপনার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। এটা আমার আর আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপার। ডোন্ট জাজ মি, অনলি আল্লাহ্ ক্যান জাজ মি!

হ্যাঁ, সত্য কথা। শুধু আল্লাহই আপনার বিচার করবেন। কিন্তু সমস্যা হলো আপনার গুনাহর প্রভাব আমার ওপর পড়ে, আমার স্ত্রীর উপর পড়ে, আমার বাচ্চাদের উপর পড়ে, পুরো উম্মাহর উপর পড়ে। তাই আপনাকে গুনাহ করতে দেখলে, হারামে লিপ্ত হতে দেখলে আমার এতে বাধা না দিয়ে উপায় থাকে না। রাসূল (সা.) এর সহিহ হাদিসে আছে, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকো। এটা এই উম্মাহর দায়িত্ব। এটা শুধু আলিম ওলামার একার দায়িত্ব না। ঈমান ও তাওহিদওয়ালা প্রতিটা মানুষের দায়িত্ব হলো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। এখন

আপনি যদি বলেন, আমি না করলে সমস্যা কোথায়? আমি আমার কাজ নিয়ে থাকলাম, অন্যেরা অন্যদেরটা নিয়ে থাকল। রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা যদি তা না করো, তাহলে আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি আযাব পাঠাবেন। তোমরা আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করবে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের দুআ কবুল করবেন না।

আমি যখন এখানে আসার জন্য সিডনী থেকে রওনা হলাম, আমি চার ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। কারণ আমি মানসিকভাবে ইন্টারোগেশানের জন্য প্রস্তুত। আমাকে হাজারো প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন আমি আমার দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। আমি আমার নিজের ঘরে অপরাধীতে পরিণত হয়েছি। আমি জানি যখন আমি লন্ডন এয়ারপোর্টে পৌঁছাব, তখন আমাকে তিন-চার ঘণ্টা ইন্টারোগেশানের মুখে পড়তে হবে। কেন? কারণ আমাকে মুসলিমদের মতো দেখা যায়। আমাদের অত বিলাসিতা করা সাজে না যে, গুনাহ করব আর বলব অনলি আল্লাহ ক্যান জাজ মি। কারণ আমার গুনাহ্ আপনাকে প্রভাবিত করে, আপনার গুনাহ্ আমাকে প্রভাবিত করে।

যে কেউ খালেসভাবে কালিমা পড়েছে, আপনি মানুন আর না মানুন, সে মুসলিম। সে মসজিদে আসলো কী আসলো না, সে আপনার মাযহাব অনুসরণ করে কি করে না, সে রোজা রাখল কি রাখলো না, আপনার পীর-মাশায়েখরা তাকে স্বীকার করে কি করে না, এসবের দ্বারা এই বাস্তবতা পরিবর্তন হয়ে যায় না যে, সে একজন মুসলিম। তার পক্ষ থেকে একেবারে স্পষ্ট বড় কুফর প্রকাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত সে এই উম্মাহর অংশ। অনেকে এসব শুনে মাঝেমাঝে ক্ষেপে যায়—কে আপনাকে এসব বলার অধিকার দিয়েছে? কিন্তু তার আগে আপনি বলুন, আপনাকে কে অধিকার দিয়েছে তাকে মুসলিমের খাতা থেকে কেটে দেওয়ার? এমনকি সাহাবারা যে কাজ করেননি। এমনকি রাসূল (সা.) মুনাফিকদেরকে একদম সমাজের ভেতরে রেখে চলতেন, তাদেরকে চিনতেন, তাদের তালিকা করে রেখেছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে কাছের সাহাবারাও তাদের নাম জানতে পারেননি। আর আজকে আমি-আপনি কীভাবে ঠিক করে দিচ্ছি কে মুসলিম, আর কে মুসলিম না? কে মুনাফিক, কে সহিহ দ্বীনদার? মানুষ বলে ইসলাম মানেই নাকি ভালোবাসা আর সম্প্রীতি! কীসের সম্প্রীতি! আমরা তো আমাদের নিজেদের সমাজেই ঐক্যবদ্ধ না, নিজেদের মসজিদেই ঐক্যবদ্ধ না। আমাদের নিজেদের পরিবারে ভালোবাসা নেই, সহনশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা নেই। হাসাহাসি, বিদ্রূপ, ঠাট্টা মশকরা করাটাই নিয়ম হয়ে গেছে। যেকোনো এক চ্যাংড়া ছেলে মাইক তুলে নিয়ে এই আলিম ওই আলিমকে গালাগালি করতে থাকে। যেন তার কাঁধে পুরো

উম্মাহর দায়িত্ব এসে পড়েছে। আর আমরা ভাবি আমাদের সাথে এসব কেন হচ্ছে! কেন আজ মুসলিমদের এই অবস্থা? কেন উম্মাহর এই অবস্থা? কেন আল্লাহর সাহায্য আসছে না? উত্তরটা সহজ, এর জন্য আপনি-আমিই দায়ী।

আমাদের কাজের প্রভাব উম্মাহর উপর পড়ে। তারপরও যেখানেই যাই, শুনি, ভাই জানেন? অমুক আলিম না এইরকম, তমুক আলিম এইটা বলে। ভালো কথা! তো আপনি কী করছেন? আমি! আমি তো কিছুই না। আমার কথা কে শুনবে? কিন্তু কেন আপনি "কিচ্ছু না"? কেন আপনার কোনো প্রভাব নেই? কেন আপনি সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি, কিংবা পারছেন না? আপনি যখন বিশ্বাস করতে শুরু করবেন আপনি কিছু না, তখন থেকেই আপনি 'কিছু না' হয়ে যাবেন। আপনি যখন বিশ্বাস করতে শুরু করবেন আপনি কেউ না, তখন থেকেই আপনি 'কেউ না' হয়ে যাবেন। আমাদের উদ্যম আজ এভাবেই ভেঙে পড়েছে। দ্বীনের সাথে সংস্পর্শ নষ্ট হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ আল-ফাতিহর যখন চার বছর বয়স, তখন তার মা তাকে সাগরের পাড়ে নিয়ে যেতেন। বলতেন, ওই পাড়ের ওই অঞ্চলটা দেখছ? একদিন তুমি তা বিজয় করবে। আজকে চার বছরের বাচ্চাকে আমরা মসজিদ থেকেই তাড়িয়ে দিই, নোটিশ টাঙিয়ে দিই—'এখানে ৭ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের আসা নিষেধ।' কাকে দোষ দেব আমরা? সব দোষ কাফিরদের, সব পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র? পশ্চিমা সরকাররা কি আপনাকে শিখিয়েছে বাচ্চার সাথে এমন আচরণ করতে? কোন সরকার আপনার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বলেছে তোমার বউয়ের সাথে খারাপ আচরণ করো?

আবার এখন কিছু একটা হলেই কালো জাদু, জিন, রুকইয়া—এটা যেন সবাইকে আছর করে রেখেছে! এর সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে, ওর হাত কাঁপতে শুরু করেছে, আর অমনি ধরে নিচ্ছে কেউ তাকে কালো জাদু করেছে। আর শুরু হলো এই শাইখের কাছে ধরনা, ওই শাইখের কাছে দৌড়াদৌড়ি। কিন্তু নিজের চারিত্রিক সমস্যার কারণেও ঝামেলা হতে পারে, এই বাস্তবতার মুখোমুখি আমরা কেউ হতে চাই না। আপনার বিয়ে টিকছে না কারণ হয়তো আপনি ব্যর্থ পিতা, স্বামী হিসেবে আপনি ভালো না। মানুষ ফোন করে বলে, ভাই! যুবসমাজের আজকে এই সমস্যা, ওই সমস্যা। এটা নিয়ে কথা বলেন, ওটা নিয়ে কথা বলেন। যেই যুবসমাজ নিয়ে আপনি নালিশ করেন, এটা ওই যুবসমাজের সমস্যা না। এগুলো আপনার নিজের কাজকর্মের ফলাফল, আপনার নিজের প্রতিবিম্ব। আপনার অবাধ্য সন্তান আপনারই প্রতিচ্ছবি। আপনার সন্তান ব্যর্থ কারণ আপনি পিতা হিসেবে ব্যর্থ। কিন্তু আমরা কেউ দোষ নিজের ঘাড়ে নিতে চাই না। আমার ছেলে খারাপ, কারণ সে

খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে। তো আপনি তখন কোথায় ছিলেন? চাকরি, ব্যবসা, নিজের কাজে ব্যস্ত! তো আপনার ছেলেকে বড় করছে কে? আমি জানি আপনার রুটি-রুজি কামাতে হয়। কিন্তু আপনিই তো বেছে নিয়েছেন প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার খরচ। আপনিই তো বেছে নিয়েছেন দামী দামী জায়গায় বাড়ি করা, কারণ কম দামী জায়গায় থাকলে খারাপ দেখায়। আপনার গাড়ির মডেল আপডেট না হলে চলেই না। সন্তানকে অন্যদের হাতে বড় হতে দিয়ে আপনিই এ জীবন বেছে নিয়েছেন।

আমাদের এসব সমস্যার সমাধান হলো দ্বীন। মানুষ সবসময় অলৌকিক কিছুর অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু সেই আলৌকিক সমাধান আছে সেই প্রেসক্রিপশনে, যা স্বয়ং আল্লাহ মানবজাতির জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

> "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।" (সূরাহ মায়েদা, ৫:৩)

আপনি যেই সমস্যার মুখোমুখিই হোন না কেন, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহয় অবশ্যই এর সমাধান আছে। সমস্যার সমাধান চান? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দ্বীনের দিকে আসুন। আপনি এই সংশয়, ওই দ্বিধায় পড়ছেন কারণ আমাদের জীবন থেকে দ্বীন হারিয়ে গেছে। আজকে যদি বলা হয় এটা রাসূলের সুন্নাহ, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া হয়, ও আচ্ছা, সুন্নাহ? আমি আরো ভাবলাম ফরয, করতেই হবে বুঝি! যাক, বাঁচা গেল! আমরা খুব আবেগ দিয়ে বলি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পথ হলো সর্বোত্তম পথ। কারো এতে দ্বিমত নেই। কিন্তু এই কথাটা সত্য নয়। কথাটা শুনলে মনে হয় এটা ছাড়াও আরো অনেক বিকল্প বৈধ পথ আছে, যেগুলোর চেয়ে রাসূলের সুন্নাহ বেশি ভালো। যেন good, better, best এর সেই ছেলেবেলার ইংরেজি শেখার মতো। কিন্তু না, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ-ই একমাত্র পথ, আর কোনো বিকল্প নেই। এক শাইখকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাহাবাদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? তিনি বললেন,

> আমরা রাসূলের সব সুন্নাহ ছেড়ে দেই, কারণ এগুলো স্রেফ সুন্নাহ! আর সাহাবাগণ সব সুন্নাহ পালন করতেন, কারণ এগুলো রাসূলের সুন্নাহ।

সাহাবাগণের জীবদ্দশায় ফরয-সুন্নাহর পার্থক্য নিয়ে কোনো আলোচনাই ছিল না। পরে যখন ফিকহ শাস্ত্র গড়ে ওঠে, তখন তাত্ত্বিক আলোচনার সুবিধার্থে, একটার চেয়ে আরেকটার গুরুত্বের পার্থক্য অনুধাবনের জন্য ফুকাহায়ে কিরাম বাধ্য

হয়েছেন এই আলোচনাগুলো সামনে আনতে। দুঃখজনকভাবে আমরা সেটা থেকে এমন অর্থ বের করেছি যেন ফরযটা বাধ্য হয়ে করা লাগে। আর কেউ সুন্নাহ পালন করলে, ওহ! মাশাআল্লাহ! ঠিক আছে, কিন্তু আমাকেও করতে হবে এমন তো না!

আপনি এই দ্বীন ছেড়ে কিসের পেছনে ছুটছেন? সত্যিই পূর্ণ সুখ-শান্তি চান? সে জিনিস কখনওই আসবে না, যতক্ষণ না আপনি রাসূল (সা.) কে পূর্ণাঙ্গভাবে নিজের মধ্যে নিয়ে আসছেন। তাই ভুলে যান পাশের মসজিদে কী হচ্ছে। ভুলে যান অমুক ইমামের কী ভুল। আমরা নিজেরা দোষ স্বীকার করার মতো সাহসী হই। নিজেদের দোষ স্বীকার করতে শিখি। তাওবা করতে শিখি। আল্লাহর দিকে আরো এক কদম অগ্রসর হতে শিখি। নিজের জন্য যদি না-ও হয়, অন্তত আমাদের পরিবার, সমাজ, এই উম্মাহর কথা চিন্তা করে হলেও!

দুনিয়াতে যেভাবে জীবন যাপন করবেন, মৃত্যুও সেভাবেই হবে।

মুহাম্মাদ নাগি। একজন অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম কিছুদিন আগে ক্যান্সারে মারা যান। ক্যান্সার ধরা পড়ার আগে এই ভাইটি ছিল একেবারেই সুস্থ। চ্যারিটি, দাওয়া, মুসলিম কমিউনিটির যেকোনো প্রয়োজনে সে সবসময় একটিভ ছিল। ক্যান্সার ধরা পড়ার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার মধ্যে তার রবের জন্য, দ্বীনের জন্য, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য যে প্রস্তুতি দেখা গেছে, তাতে আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, আল্লাহ তাকে একটি উত্তম মৃত্যু দিয়েছেন। যখনই কেউ তার সাথে দেখা করতে যেত, সবসময় তার মুখে আল্লাহর প্রশংসা, সুন্দর হাসি, এমনকি মুসলিমদের জন্য সেই কঠিন সময়েও তার কত প্ল্যান, কত স্বপ্ন। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে দ্বীনের উপর তুমি জীবন যাপন করবে, তোমার মৃত্যুও সেভাবেই হবে। আমরা ইয়াক্বিনের সাথে বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ নাগি এমন এক সুন্দর দ্বীনের উপর জীবন যাপন করেছেন, আর আল্লাহ তাকে সেই দ্বীনের উপরই মৃত্যু দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোন দ্বীনের উপর জীবন যাপন করছি? আমরা কীভাবে মৃত্যুবরণ করতে চাই? কোন অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই? কখনো এটা ভাববেন না যে, যারা ক্যান্সার বা এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এটা তাদের জন্য একটা সৌভাগ্য—ভালো কিছু। না, মাঝে মাঝে এটা ঠিক তার বিপরীতও হতে পারে। ক্যান্সার মুহাম্মাদ নাগির জন্য ভালো হয়েছে কারণ সে এমন একটি জীবন অতিবাহিত করেছে যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট ছিলেন। সে সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ রেখেছে তাই আল্লাহ তার কঠিন সময়ে তাকে স্মরণ করেছেন—সুন্দর একটি মৃত্যু দিয়েছেন। আল্লাহ এজন্য তাকে সাহায্য করেননি যে, সে বিশেষ কেউ একজন, না। সে সহজ সময়ে কঠোর পরিশ্রম করেছে, যখন সাধারণত মানুষ আল্লাহকে

ভুলে যায়, যখন সাধারণত মানুষের দ্বীনের জন্য, মসজিদের জন্য সময় থাকে না। সে আল্লাহকে সেই সময় স্মরণ করত, তাই আল্লাহ তাকে তার প্রয়োজনে মনে রেখেছেন। সঠিক সময়ে উত্তম মৃত্যু দিয়েছেন।

আমরা ভাবি, আমি তো মুসলিম, আলহামদুলিল্লাহ আমি নামাজ পড়ি, অবশ্যই আমি তাওহিদের উপর মৃত্যুবরণ করব। আপনি কীভাবে জানেন? কী প্রমাণ আছে যে তাওহিদের উপর মৃত্যুবরণ করবেন? আপনার চারপাশে এমন অনেকেই আছে, জন্মগতভাবেই মুসলিম, মুসলিম হিসেবেই বেড়ে উঠেছে, যাদের আল্লাহ ক্যান্সার দিয়েছিলেন, তবুও তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসেনি।

এক ভাই একদিন আমাকে ফোন করে জানাল পঞ্চাশোর্ধ এক বৃদ্ধ মুসলিম যিনি কখনোই নামাজ পড়েনি, কখনো সিজদা পর্যন্ত দেয়নি, বৃদ্ধ লোকটি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, হয়তোবা এটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত—দয়া করে আপনি একটু আসুন। এমনকি সেই পরিবারের কেউ নামাজ পড়ত না। লোকটি বলল হয়তো আপনি গেলে ভালো হয়, কিছু উপদেশ দিতে পারেন। যাই হোক, আমি বললাম, ঠিকাছে আপনি বলে দিন আমি আগামীকাল আসব। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর সে লোকটি আমাকে ফোন দিয়ে জানাল আমি যেন না যাই। আমি বললাম, কেন নয়? কারণ, বৃদ্ধ লোকটি যখনই শুনল ধার্মিক কেউ আসবে তার সাথে দেখা করতে, সাথে সাথে নিষেধ করে দিল। এমনকি হাসপাতালে জানিয়ে দিল তার পরিবারের সদস্য ছাড়া কেউ যেন তার কাছে আসতে না পারে। তার দুদিন পর বৃদ্ধটি মারা গেল।

আমি বলছি না সে কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তার যা হয়েছে সেটা তার আর আল্লাহর ব্যাপার। কিন্তু আপনি সেভাবেই মারা যাবেন, যেভাবে আপনি দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন। যে জীবন আপনি অতিবাহিত করেছেন, সেই জীবন নিয়েই আপনি মারা যাবেন। আপনারা আপনাদের জীবন নিয়ে এভাবে ভাবুন।

আমরা সবাই মুখে বুলি ছড়াই, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, আল্লাহর রাসূলের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। আল্লাহর আপনার মুখের জবাবের দিকে খেয়াল করবেন না, আল্লাহ আপনার কাজ দেখতে চান। নিজের জীবনের দিকে তাকান। সত্যিই আল্লাহকে ভালোবাসেন? নামাজকে, মসজিদকে ভালোবাসেন? তাহলে দেখুন এগুলোর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন! মুখে মুখে আপনি আল্লাহর ওলি! আপনি মনে করেন খুব ভালোভাবেই আল্লাহর পথে আছেন, অথচ আপনি শুধু জুম'আর নামাজে আসেন। এতটুকুই আপনার দ্বীন।

এক ভাই ফোন করে বললেন, আপনি কি জানেন জুম'আর খুতবা কখন? আমি বললাম, জি ভাই খুতবা শুরু সাড়ে বারোটায়। সে বলল, না ভাই, আমি জানতে চাচ্ছি আপনারা যে খুতবার পর নামাজ পড়েন তা কয়টায় শুরু হয়। আমি বললাম, খুতবা শুরু হয় সাড়ে বারোটায়, আপনাকে নামাজের জন্য সাড়ে বারোটায় পৌঁছাতে হবে। সে বলল, আমার খুতবা শোনার ইচ্ছা নাই, আমাকে শুধু নামাজের সময়টা বলুন। আমি এসে যেন দু'রাকাত নামাজ পড়েই চলে যেতে পারি।

এরকম দ্বীনের উপর আপনি থাকবেন, এই দ্বীনের উপরই আপনার মৃত্যু হবে।

আল্লাহকে ভালোবাসার কথা, কুরআনকে ভালোবাসার কথা আমরা সবাই দাবি করি। সত্যিই কুরআন ভালোবাসেন? কতটুকু কুরআন মুখস্ত করেছেন আপনি? কুরআনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, আসলেই? আসলেই কি আপনি কুরআনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত? এখনও আমাদের বেশিরভাগ মানুষ সেই কয়টা সূরাই জানি যেগুলো ছোটবেলায় মুখস্ত করেছিলাম, আল্লাহই ভালো জানেন তাও পুরোপুরি পড়তে পারি কি না। ২০ বছর, ৩০ বছর, এভাবে আপনার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, আপনি একটা আয়াতও মুখস্ত করতে পারলেন না, অথচ আপনি সিনা টান করে বলতে থাকেন কুরআনকে কতটা ভালোবাসেন! আপনাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এই অবস্থায়ই দাঁড়াতে হবে।

এটা ভাববেন না যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়, তারা একে ভালো পথে ব্যবহার করে। আমরা ভাবি, হ্যাঁ ভাই ক্যান্সার ভালো, এটা আপনাকে তাওবা করতে সময়, সুযোগ দেয়, যদি আমার ক্যান্সার হতো! আল্লাহু আকবর! কত বড় স্পর্ধা আমাদের। যখন কেউ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় সবাই আশ্চার্যান্বিত হয়, ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ কি আপনাকে বলেন নি যে, আপনি যেকোনো সময় মারা যেতে পারেন? আমাদের মাঝে অনেকের কোট-টাই পরিহিত আর সার্টিফিকেট পাওয়া ডাক্তারের কথায় যতটুকু বিশ্বাস আছে, ততটুকু বিশ্বাস রাসূল (সাঃ) এর হাদিসেও নেই। আপনি যখন হাদিস বা আয়াত পড়েন, মৃত্যু যেকোনো সময় আসবে, আপনি তখন আতঙ্কিত হন না, কিন্তু ডাক্তার যখন বলে, ভাই আপনাকে পরীক্ষা করে দেখলাম আপনি হয়তো আর সপ্তাহ দুএক বাঁচবেন, আপনার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে, দুই সপ্তাহ! এই কয়দিন আছে মাত্র? কিন্তু আপনি এরকম রিএকশান দেখাননি, যখন আল্লাহ বললেন যেকোনো সময় মৃত্যু আসবে!

আমাদের নিজেদের জিজ্ঞেস করা উচিত, আমরা কেমন দ্বীন পালন করছি, কারণ সেই দ্বীনের উপরই আমাদের মৃত্যু হবে। এবং আল্লাহ যেই অবস্থায় আপনার মৃত্যু দেবেন, আপনি মৃত্যুর সময় যে দ্বীন নিয়ে মারা যাবেন, আপনাকে যদি আরও এক মিলিয়ন বছর বাঁচতে দেওয়া হত, আপনি সেই আগের অবস্থায়ই থাকতেন, পরিবর্তন হতেন না। আমরা যখন দেখি কোনো বেনামাজী মারা গেছে, সত্যি তার হয়তো নামাজ পড়ার ইচ্ছে ছিল, সে হয়তো নামাজ পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছে বেনামাজি অবস্থায়, কারণ বেঁচে থাকা অবস্থায় সে কখনো নামাজী ছিল না। এভাবেই আমাদের সবার মৃত্যু হবে, যেভাবে আমরা দুনিয়াতে বাঁচব, যে পথে চলব।

এই শাইখ বলেন, এক পরিবার তাকে ডেকেছে মৃত্যুশয্যায় এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখার জন্য। শাইখ বললেন, আমি তাঁদের বাড়ি গেলাম, গাড়ি পার্কিং করে যাওয়ার সময় শুনলাম পুরো বাড়িতে উচ্চস্বরে গান বাজছে। তিনি বললেন, আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারা অন্তত কুরআন তিলাওয়াত বা অন্যকিছু ছেড়ে দিতে পারত। তাঁদের পিতা মারা যাচ্ছে অথচ সেখানে উচ্চস্বরে গান বাজছে। আমি যখন গেলাম তখন অস্বস্তি দূর করার জন্য তারা গান বন্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দিল। কিন্তু জানেন এরপর কি হলো? তাঁদের পিতা বিছানায় মৃত্যুশয্যা থেকে বলে উঠল, বন্ধ করো এটা, গান ছেড়ে দাও, তা আমার হৃদয়ে প্রশান্তি দেয়। এভাবেই মৃত্যু হবে, যেভাবে আপনি বেঁচে থাকবেন, সেভাবেই আপনি মারা যাবেন।

অন্যদের না দেখে নিজেকে দেখুন। আর কত সময় আপনাকে এসব শুনতে হবে? কত জানাযায় উপস্থিত হতে হবে? আমরা সবাই-ই মুসলিম, কিন্তু কেমন মুসলিম? কোন পর্যায়ের মুসলিম? আজকে আপনার সন্তান যদি অসুস্থ হয়ে যায়, আপনি মুখে না বললেও ভেতরে ঠিকই ভাবেন যে, আল্লাহ কেন আমার সাথে এমন করল, আমি তো নামাজ পড়ি, দান করি, যাকাত দেই! কিন্তু ঐ লোক নামাজ পড়ে না, অথচ তার সন্তানেরা সুখে আছে। আপনি কি এরকম হৃদয় নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চান?

মুহাম্মাদ নাগির জন্য আমার হিংসা হচ্ছে, কারণ এরকম খুব কমই আছে যারা উত্তমভাবে মৃত্যুবরণ করে। আমার হিংসা হচ্ছে, কারণ আমি জানি না কীভাবে আমি মারা যাবো।

আমরা আল্লাহকে একের পর এক কথা দেই। রামাদান আসে রামাদান যায়, হজ্জ আসে হজ্জ যায়, কত মানুষ মারা যায়, কত চুক্তি শেষ হয়, অথচ প্রত্যেকবার আমরা অজুহাত দেখাই আল্লাহর কাছে। তিনি আমাদের রব, যিনি প্রতিটা সময় আমাদের অপেক্ষায় থাকেন, কবে আমরা তাঁর কাছে তাওবা করব, কবে আমরা ইয়া রব বলে ডাক দিব। আর আমরা অপেক্ষায় থাকি, সবকিছু একটু গুছিয়ে উঠেই আল্লাহকে সময় দেব, পরিবার, সন্তান, ব্যবসা সব সেটেল হয়ে গেলে ভালো হয়ে যাব। কিন্তু তার আগেই হয়তো আল্লাহর কাছে আমাদের হাজিরা দেওয়ার সময় চলে আসে। তাই নিজেকে প্রশ্ন করুন আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? আপনার নামাজ কেমন? কুরআনের সাথে সম্পর্ক কেমন? আপনার দ্বীন কেমন? কারণ, যে দ্বীনের উপর আপনি জীবন যাপন করবেন, সেই দ্বীনের উপরই আপনার মৃত্যু হবে।

জাইরা ওয়াসিম—
এক বলিউড তারকার আবেগঘন প্রত্যাবর্তন

(জাইরা ওয়াসিম। সাম্প্রতিক সময়ের একজন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী। অভিনয় করেছেন তুমুল জনপ্রিয় কিছু ছবিতে। একদিন হঠাৎ ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়ে তিনি বলিউড জগতের সাথে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘোষণা দেন। আবেগঘন, অনুপ্রেরণাদায়ী সেই লেখাটার অনুবাদ এটি। আল্লাহ যেন এই কথাগুলো, হৃদয়ের এই উপলব্ধিগুলো আরো হাজারো মানুষের হিদায়াতের উছিলা বানিয়ে দেন। আমীন।)

"আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি এমন একটি সিদ্ধান্ত নিই, যাতে আমার জীবনটাই পাল্টে যায়। বলিউডে তখন পা রাখামাত্রই বিপুল খ্যাতি আমাকে ঘিরে ধরে। আমাকে ঘিরেই যেন সবার আগ্রহ। মিডিয়া আমাকে উপস্থাপন করতে শুরু করে তরুণ সমাজের সাফল্যের চূড়ান্ত উদাহরণ হিসেবে। এটা আসলে কখনওই আমার লক্ষ্য ছিল না। বিশেষ করে সাফল্য-ব্যর্থতার যে নতুন ধারণা আমি আত্মস্থ করেছি, তা একেবারেই আলাদা।

পাঁচ বছর পাড়ি দিয়ে আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার এই পেশাগত পরিচয় নিয়ে আমি একদমই খুশি নই। আমি যেন খুব লম্বা সময় ধরে এমন এক মানুষ হতে চাইছি, যা আসলে আমি নই। আমার সারাটা সময়, শ্রম আর আবেগ ব্যয় হচ্ছে যে দুনিয়ায়, সেখানে আমি চাইলেই খাপে খাপে বসতে পারি। কিন্তু আসলে এই জগৎ আমার নয়, আমিও এ জগতের কেউ নই। এই জগৎ আমাকে প্রচুর ভালোবাসা, খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে বটে; কিন্তু তার সাথে দিয়ে গেছে অজ্ঞতার অন্ধকার। নীরবে এবং নিজের অজান্তে আমি একটু একটু করে ঈমানের পথ থেকে সরে যেতে থাকি। যে ধরনের পরিবেশে আমাকে কাজ করতে হতো, তা ক্রমাগত আমার ঈমানের ক্ষতি করতে থাকে। নিজের ধর্মের সাথে আমার সম্পর্ক হুমকির মুখে পড়ে যায়। আমি জোর করে নিজেকে বুঝ দিতাম যে, এগুলো করলে ধর্মের

কোনো ক্ষতি হয় না। অথচ আমার জীবন থেকে বারাকাহ হারিয়ে যেতে থাকে। 'বারাকাহ' কথাটার অর্থ কেবল সুখ বা আনন্দ না, প্রশান্তি আর স্থিতিশীলতাও এর অন্তর্ভুক্ত। আমি এগুলোর খুবই অভাব বোধ করতে শুরু করি।

চিন্তা আর প্রবৃত্তির মাঝে বোঝাপড়া করিয়ে নিজের ঈমানের একটি স্থিতিশীল চিত্র তৈরি করার চেষ্টা করতাম। একবার না, দুইবার না; বারবার, হাজারবার। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হই। একদিন বদলে যাব—এই চিন্তায় আটকে থেকে দিনের পর দিন আমি ওই একই মানুষটিই রয়ে গেলাম। সবসময় নিজেকে বুঝ দিতাম যে, সময়মতো সব ঠিকঠাক করে নেব, তার আগ পর্যন্ত একটু সময় নিই। সেইসাথে প্রতিনিয়ত নিজেকে ঈমান ও প্রশান্তি বিনষ্টকারী পরিবেশে ছুঁড়ে ফেলার ব্যাপারটা তো ছিলই। সবকিছুকে আমি সোজাসুজি না নিয়ে বাঁকাভাবে দেখতাম। বাস্তবতা থেকে আমি সারাক্ষণই পালাতে চাইতাম। তবুও বুঝতাম কীসের যেন একটা অভাব আমাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি যেন পথের শেষে পথ হারিয়ে এক অবোধ্য যন্ত্রণায় মাথা কুটে মরছি। অবশেষে আমি যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে নিজের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার মুখোমুখি হলাম। শুরু করলাম আল্লাহর বাণীর সাথে অন্তরকে সংযুক্ত করে নিজের অজ্ঞতার চিকিৎসা। কুরআনের মহান ঐশী জ্ঞানে খুঁজে পেলাম পূর্ণতা ও প্রশান্তি। হৃদয় তো আসলে তখনই প্রশান্ত হয়, যখন সে তার স্রষ্টার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। তাঁর দয়া ও আদেশ-নিষেধগুলো জানতে পারে।

আমি অতি-আত্মবিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে একদমই আল্লাহর রহমত ও হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ি। ধর্মের একদম মৌলিক বিষয়গুলোতে নিজের অজ্ঞতা আমার কাছে ধরা পড়ে। বুঝতে পারি যে, নিজের পার্থিব কামনা-বাসনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফল হলো অন্তরের এই প্রশান্তির অভাব। অন্তরের রোগ প্রধানত দুই প্রকার। একটি হলো সংশয় ও ভ্রান্তি, আরেকটি হলো খেয়াল-খুশি ও কামনা-বাসনা। কুরআনে দুই ধরনের রোগের কথাই আছে। আল্লাহ বলেন,

> "তাদের অন্তরে রয়েছে (সংশয় ও কপটতার) রোগ এবং আল্লাহ তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরাহ আল-বাকারা ২:১০)

আমার বোধোদয় হলো যে, এই রোগের চিকিৎসা কেবল আল্লাহর দেওয়া হিদায়াতের মাধ্যমেই হতে পারে। আর সত্যিই তিনি আমাকে হিদায়াত করতে শুরু করেন।

কুরআন এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ হয়ে ওঠে আমার মানদণ্ড। এগুলোর ভিত্তিতেই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জীবনের অর্থের সন্ধান করতে থাকি।

মানুষের চাহিদা হলো তার নৈতিক বিশ্বাসের প্রতিফলন; বাহ্যিক আচরণ হলো অন্তরের পূর্ণতার নির্দেশক। তেমনি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে আল্লাহ ও দ্বীন ইসলামের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন। জীবনের আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য ও অর্থও নির্ধারিত হয় এগুলোর মাধ্যমে। সাফল্য এবং জীবনের অর্থ-উদ্দেশ্যকে আমি যেভাবে বুঝতাম, সেগুলোকে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। আমার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রক নীতিমালা এক নতুন মাত্রা পেল। জীবনকে আমরা যে একচোখা, সংকীর্ণ ও গতানুগতিক দৃষ্টি দিয়ে দেখি, সেগুলো দিয়ে আসলে সাফল্য নির্ধারিত হয় না। আসল সাফল্য হলো আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। অন্ধভাবে জীবনের পথ চলতে চলতে আমরা ভুলেই যাই কেন আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

> "যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাদের অন্তরকে ওই দিকে অনুরক্ত হতে দাও; এবং তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আর তারা যেসব কাজ করে তা যেন তারা আরও করতে থাকে।" (সূরাহ আল-আন'আম ৬:১১৩)

ভালো-মন্দ কখনও ব্যক্তিস্বার্থ বা পার্থিব মানদণ্ডে নির্ধারিত হয় না। আল্লাহ বলেন,

> "(ক্ষয়িষ্ণু) সময়ের শপথ। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিতে নিমজ্জিত। শুধু তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সত্যের দিকে আহ্বান করে এবং ধৈর্যের আহ্বান করে।" (সূরাহ আল-আসর ১০৩: ১-৩)

আত্মার সাথে এই দীর্ঘ যুদ্ধ আমার জন্য বড় ক্লান্তিকর ছিল। জীবনটা ছোট, আবার নিজের সাথে যুদ্ধ করে যাওয়াটা বড় দীর্ঘ। অবশেষে আজই সেই দিন, যেদিন আমি জেনেবুঝেই এই পেশার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের খোলাখুলি ঘোষণা দিচ্ছি। এই যাত্রার সফলতা নির্ভর করে প্রথম পদক্ষেপটি কীভাবে নিচ্ছেন, তার উপর। নিজেকে খুব পূত-পবিত্র হিসেবে তুলে ধরাটা আমার এই প্রকাশ্য ঘোষণার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার এই নতুন জীবন সূচনার প্রাক্কালে এইটুকু আমার করাই উচিত। এটা কেবলই আমার প্রথম পদক্ষেপ। এই পথে চলতে শুরু করা আমার স্বচ্ছ উপলব্ধির ফল। আমি এই পথেই থাকতে চাই, এর জন্যেই সংগ্রাম করে যেতে চাই। অতীতে আমি জেনে বা না জেনে অনেক মানুষের মনে উচ্চাশার বীজ বপন করে থাকতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার একটি আন্তরিক পরামর্শ। কারো সাফল্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি বা সম্পদ যত বেশিই হোক না কেন, আপনার অন্তরের প্রশান্তি এবং ঈমানের নূরের তুলনায় এগুলো একদমই মূল্যহীন। কুপ্রবৃত্তির কাছে যেন

আত্মসমর্পণ করতে না হয়, সে জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। কারণ কামনা-বাসনার আসলে কোনো শেষ নেই। এইমাত্র যা পেলেন, একটু পরই এরচেয়ে বেশি কিছু একটা পেতে মনে চাইবে। দ্বীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সত্যকে গোপন করে কেবল নিজের ইচ্ছে-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশের অনুসরণ করা মানে নিজের সাথে প্রতারণা করা। নিজেদের ঈমানের গুরুতর ত্রুটিকে আমরা কখনও কখনও দার্শনিক কথাবার্তা দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের মুখ যা বলে, অন্তরে তা থাকে না। তারপরও আমরা একে আঁকড়ে ধরার অজুহাত খুঁজি। আল্লাহ কিন্তু আমাদের এই স্ববিরোধিতার কথা ঠিকই জানেন। তিনি সব না-বলা কথা জানেন। তিনি সর্বশ্রোতা (আস-সামি'), সর্বদ্রষ্টা (আল-বাসীর) এবং সর্বজ্ঞানী (আল-'আলীম)। "আর আল্লাহ জানেন, যা তোমরা গোপন করো এবং যা তোমরা প্রকাশ করো।" (সূরাহ আন-নাহল ১৬:১৯)

নিজের ভ্রান্ত মতবাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে সত্যিকারের চেষ্টা করুন। ঈমান ও ইখলাসে ভরা একটি অন্তর দিয়ে তখন সত্যকে উদ্ঘাটন করতে পারবেন। "হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান-নির্ণায়ক শক্তি দান করবেন।" (সূরাহ আল-আন'আম ৮:২৯)

আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও সীমালঙ্ঘনের মাঝে কখনও সাফল্যের রোল মডেল খুঁজতে যাবেন না। এ ধরনের মানুষগুলো যেন আপনার পছন্দ-অপছন্দ বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নিয়ামক না হয়ে ওঠে। নবি (সা.) বলেন, "মানুষ যাকে ভালোবাসে, তার সাথেই (হাশরের ময়দানে) থাকবে।" জ্ঞানীদের কাছ থেকে অজানা বিষয়গুলো জেনে নিন। অহংকার ঝেড়ে ফেলুন। আল্লাহর দেওয়া হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হোন। তিনিই অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। কোন জিনিসটা জানতে হবে বা পরিবর্তন করতে হবে, তা বুঝতে পারার মতো জ্ঞানবুদ্ধি সবার থাকে না। কাজেই এ ধরনের মানুষগুলোকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, গালমন্দ করা, ছোট করা বা উপহাস করাও অনুচিত। বরং আমাদেরই দায়িত্ব হলো পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সঠিক উপলব্ধি অর্জনে সাহায্য করা। ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা। "আর স্মরণ করিয়ে দাও, নিশ্চয় স্মরণ করিয়ে দিলে মুমিনরা উপকৃত হয়।" (সূরাহ আয-যারিয়াত ৫১:৫৫)

শত্রু শত্রু ভাব নিয়ে মানুষের উপর 'হক কথা' ছুঁড়ে মারলে বা জোর করে গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই কাজ হবে না। বরং নম্রতা ও দয়ার মাধ্যমে আশপাশের মানুষদের মন জয় করতে হবে।

"যদি কাউকে ভুল করতে দেখো, তাকে সংশোধন করে দেবে। তার জন্য দুআ করবে। তাকে অপমান করার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করবে না।"—উমার বিন আল-খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

কিন্তু সেটা করার আগে নিজের হৃদয়, কাজ, নিয়ত ও আচরণে ইসলামের সঠিক উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তারপর অন্যের উপকারে এগুলো ব্যবহার করতে হবে। উপলব্ধি, বিশ্বাস ও আচরণ সংক্রান্ত দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো যাদের কাছে অস্পষ্ট, তাদের এগুলো বুঝতে সাহায্য করতে হবে। আর মনে রাখবেন, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার এই পথে যাত্রা শুরু করলে বাধা, বিপত্তি, ঠাট্টা, নিন্দার মুখোমুখি হওয়া লাগবেই। এমনকি আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষগুলোর কাছ থেকেই এ ধরনের আচরণ পেতে পারেন সবচেয়ে বেশি। আপনার অতীত জীবনের কথা তুলে মানুষ খোঁটা মারতে পারে। কিন্তু এতে আশা হারাবেন না। আল্লাহর দয়া ও হিদায়াত থেকে নিরাশ হবেন না। আল্লাহ হলেন আল-হাদি (পথপ্রদর্শনকারী)। অতীতের কথা ভেবে তাওবাহ করা থামিয়ে দেবেন না। কারণ আল্লাহ আল-গাফফার (বারবার ক্ষমাকারী)। "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালোবাসেন।" (সূরাহ আল-বাকারা ২:২২২)

অন্যের মন্তব্য, বিদ্রূপ, গালাগালি, কথাবার্তা বা মানুষের প্রতি ভয় যেন আপনাকে এ পথ থেকে সরিয়ে না দেয়। আপনার বিশ্বাসকে পুরোপুরি প্রকাশ করুন। আল্লাহই আপনার আল-ওয়ালি (অভিভাবক, সাহায্যকারী)। ভবিষ্যতে কী বিপদ হবে বা হবে না, এগুলো নিয়ে ভয়ে মূর্ছা যাবেন না। কারণ আল্লাহ হলেন আর-রাযযাক (রিযিকদাতা)। এ এক দুর্গম, জটিল ও সঙ্গীবিহীন যাত্রা হতে পারে। বিশেষত এখনকার যুগে তো বটেই। কিন্তু মনে রাখবেন আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে, যখন দ্বীন আঁকড়ে ধরে রাখা জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার মতো কষ্টকর হবে।"

আল্লাহ যেন আমাদের তরীগুলোকে পথ দেখিয়ে তীরে নিয়ে ভেড়ান, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করেন। আল্লাহ যেন আমাদের ঈমান মজবুত করে দেন, তাঁর যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, অন্তরের অবিচলতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা দান করেন। আল্লাহ যেন তাঁর প্রজ্ঞার গভীর বুঝ আমাদের দান করেন, নিজেদের সংশয় ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে অপরের হিদায়াতের উসিলা হতে সাহায্য করেন। তিনি যেন আমাদের অন্তরকে কপটতা, অহংকার ও অজ্ঞতা থেকে পবিত্র করে দেন। নিয়ত, কথা ও কাজে পরিশুদ্ধি দান করেন। আমীন।"

ধন্যবাদ মা!

আমার এক বন্ধুর মা অনেক দিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। কিছুদিন আগে খবর পেলাম তিনি মৃত্যুশয্যায়, শেষ অবস্থা চলছে। খবর পেয়ে আমি আমার বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলাম। বন্ধু তার মায়ের অসুস্থতার হালচাল বলতে বলতে হঠাৎ কাঁদতে লাগল। আমি ভাবলাম তার মা এভাবে কষ্ট পাচ্ছে, চোখের সামনে মারা যাচ্ছে, সেজন্যই হয়তো কাঁদছে, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি যথাসম্ভব তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম, বোঝালাম মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, সবাইকেই তো একদিন না একদিন মৃতুবরণ করতে হবে। বন্ধু বলল,

> "আমার মা মারা যাচ্ছে এতে আমি কষ্ট পাচ্ছি সত্য, কিন্তু আমার কান্নার কারণ এটা নয়। আমি কাঁদছি কারণ এই পুরো জীবনে আমার মা আমার জন্য যা করেছে, সেজন্য আমি কোনোদিন তাকে ধন্যবাদ দেইনি। একবারও না। একবারও কোনোদিন বলিনি, 'মা তোমাকে ধন্যবাদ!' আর আজ আমার মা পাশের রুমেই আছে, সাকারাতুল মাউত চলছে, আমি গিয়ে যদি ধন্যবাদ জানাইও, সে বুঝতেও পারবে না আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

ব্যাপারটা নিয়ে কী আমরা কখনো এভাবে ভেবেছি? শেষ কবে আপনি আপনার মা'কে গিয়ে বলেছেন, তুমি আমার জন্য যা করেছ তার জন্য ধন্যবাদ মা! মনে করার চেষ্টা করুন তো? ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য বিশেষ আয়োজন করতে হবে, হাতে ফুল কিংবা উপহার নিয়ে হাজির হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ধন্যবাদ জানানো মানে কারো কাজকে এপ্রেসিয়েট করা, তার অবদানকে স্বীকার করা, উত্তম আচরণ, দয়া আর ভালোবাসায় তার প্রতিদান দেওয়া।

আপনার মা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আপনাকে আগলে রেখেছে, কখনো আপনাকে এতটুকু কষ্ট পেতে দেয়নি, কখনো আপনাকে ছেড়ে চলে যায়নি, আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঘিরেই তার একটা জীবন কেটে গেছে। সেই মা আপনার

জন্য যা করেছে তার জন্য অন্তর থেকে আসা কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসার মিশেলে জড়িয়ে ধরে কখনো বলেছেন—'ধন্যবাদ মা'। আমাদের মধ্যে যাদের মা এখনো বেঁচে আছে, তারা এই ব্যাপারটা অনুভব করতে পারে না। একদিন যখন আপনার মা দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, আপনি বসে বসে কাঁদবেন আর বেঁচে থাকা অবস্থায় জড়িয়ে ধরে একটা ধন্যবাদ না জানানোর জন্য আফসোস করবেন। তখন খুব করে ইচ্ছে হবে মায়ের সেবা করি, মায়ের জন্য এটা করি ওটা করি, কিন্তু মা যখন পাশেই থাকে, পাশের রুমেই, তখন আমরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারি না।

আজকে আমরা খুব ঘটা করে বিশ্ব মা দিবস পালন করি। কিন্তু ইসলামে তো প্রতিটা দিনই মা দিবস। সেই হাদিসটার কথা কে না জানে, রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে?

রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা।

এরপর?

তিনি বললেন, তোমার মা।
এরপর?
তিনি বললেন, তোমার মা।

এরপর?
তিনি বললেন, এরপর তোমার বাবা।

আমরা হাদিসটাকে খুব সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করি। আমরা মনে করি এখানে শুধু ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য বোঝানো হয়েছে। আমার মা বেশি ভালোবাসা পাবে আমার বাবার চেয়ে। আসলে ব্যাপারটা এরকম নয়। এর অর্থ হলো আপনার অর্থ সম্পদ, সময়, স্বাস্থ্য, আপনার যা কিছু আছে সবকিছু—সবকিছুর উপর সবচেয়ে বেশি হকদার আপনার মা, আপনার মা, আপনার মা, এবং এরপর আপনার বাবা।

সুতরাং ভাই ও বোনেরা, যাদের মা এখনো বেঁচে আছে তারা মায়ের মৃত্যুর পর আফসোস করার জন্য অপেক্ষা না করে এখনোই সময়ের সদ্ব্যবহার করে নিন। আপনার মা'কে একবার বলুন, বারবার বলুন, প্রতিদিন বলুন—'ধন্যবাদ মা'!

একটি সেলফি রিমাইন্ডার!

আজকের পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের বানানো এক মিথ্যা জগতে বসবাস করে। নিজেকে জাহির করা, নিজের সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, শানশওকত মানুষকে দেখানোর মধ্যে আমরা এক ধরনের আনন্দ অনুভব করি। প্রযুক্তির একটার পর একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের এই জাহির করার কাজটাকে আরো সহজ করে দিচ্ছে। ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম—এসব ছাড়া আজ মানুষের জীবন কল্পনাও করা যায় না। প্রতিটি সময় মানুষ কি করছে না করছে তার আপডেট না জানালে যেন তাদের পেটের ভাত হজমই হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে তার বিস্ময়কর এক ধাপ হলো—সেলফি।

আপনি যদি নিজের জীবন মানুষের সাথে শেয়ার করার ব্যাপারে এত আন্তরিকই হন, তাহলে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই কেন সেলফি তুলে আপলোড করেন না? যখন আপনার চোখের কোণায় ময়লা লেগে থাকে, তখন থেকেই ছবি তোলা শুরু করেন না কেন? কিন্তু না! কখন কোন অবস্থায়, কোন ভঙ্গিমায়, কোন এঙ্গেলে ছবি তোলা হবে তা অনেক যাচাই বাছাইয়ের পর ঠিক করা হয়। আমরা শুধু এমন সময়ই ছবি তুলি যখন আমরা কোথাও ঘুরতে গিয়েছি কিংবা যখন নতুন পোশাক পরেছি, কিংবা যখন মজাদার কিছু খাচ্ছি। আর আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করি যেন পৃথিবীকে দেখাতে পারি আমরা জীবনকে উপভোগ করছি। আমরা পৃথিবীকে দেখাতে চাই আমাদের জীবনটা অনেক অসাধারণ, একদম ফাটাফাটি। কিন্তু সত্য হলো এটা আপনার জীবনের বাস্তব চিত্র না—আপনি কোনো রূপকথার জীবনযাপন করেন না। আপনিও মানুষ। আপনার দুঃখ আছে, অভাব আছে, ত্রুটি আছে, সীমাবদ্ধতা আছে। হাজারটা ছবি থেকে বাছাই করে, এডিট করে, নানান এফেক্ট দিয়ে আকর্ষনীয় করে আপলোড করা ফেসবুকের ঐ প্রফাইক পিকচারের মানুষটি আসল আপনি নন। এটা দেখে যারা মুগ্ধ হচ্ছে তারা আসলে আপনাকে

দেখে মুগ্ধ হচ্ছে না—আপনি উপরে যে মুখোশ দিয়ে রেখেছেন সেটা দেখে মুগ্ধ হচ্ছে।

আপনিও অন্য সব মানুষের মতই, আপনার জীবনও অন্য সবার মতই। আচ্ছা ধরলাম আসলেই আপনি খুব সুখী, তবুও তা দুনিয়ার সবাইকে প্রচার করে বেড়ানোর দরকার কী? কেননা, মানুষ যখন আপনাকে হিংসা করতে শুরু করবে, আপনার যা আছে তারা সেগুলো কামনা করা শুরু করবে, এবং তারা চাইবে আপনার যা আছে আল্লাহ যেন সেগুলো আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেন ও তাদেরকে দান করেন। বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যেও এসব কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কেন? কারণ আমরা প্রতিনিয়ত এমন এক জীবন যাপনের চেষ্টা করি, এমন এক জীবনের স্বপ্ন দেখি যে জীবন আমাদের না। যদি আল্লাহ আপনাকে মাসে দশ হাজার টাকা রোজগারের সামর্থ্য দেন, তাহলে এমন একজন মানুষের মতো জীবনযাপন করুন যার রোজগার মাসে দশ হাজার টাকা।

কিন্তু না! যে লোক মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করে আমি চাই তার মতো করে জীবন যাপন করতে। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে তা দেননি। আল্লাহ আপনাকে এমন কিছু নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না যা তিনি আপনাকে দেননি। কাজেই কেন নিজের জীবনকে জটিল করে তুলছেন? যেসব ভাই কাজের জন্য সারাদিন বাইরে থাকেন, আর কাজের ফাঁকে তাদের সামনে পড়ে যাওয়া প্রতিটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন, প্রশংসার দৃষ্টিতে, কামনার দৃষ্টিতে! আবার সেই ভাই বাসায় ফিরে বলেন, ধুর! আমার স্ত্রীকে আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়! অবশ্যই! আপনার কাছে আপনার স্ত্রীকে বিরক্তিকর মনে হবারই কথা! পরস্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আপনার জীবনের যতখানি সময় আপনি নষ্ট করেছেন, তার ১০% সময়ও যদি আল্লাহ আপনাকে যাকে দিয়েছেন, সেই মানুষটির দিকে তাকিয়ে ব্যয় করতেন, তবে হয়তো আপনি তারও প্রশংসা করতেন। কিন্তু আপনি তা করেন না। কারণ আপনি এমন জিনিসের প্রতি নজর দিচ্ছেন যা পাওনার না। আপনি এমন কিছু নিয়ে মেতে আছেন যা আপনার না। এমন একটি জীবন যাপন করতে চাইছেন যা আপনার জন্য না! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি নিজের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে শিখুন, এটাই যথেষ্ট।

অনেকে আছে যারা দীর্ঘসময় ফেসবুকে নষ্ট করে। কিন্তু কেন? আপনার বাস্তব জীবন কি এতই বিরক্তিকর? আপনার জীবনে আর কোনো কাজ নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই? মানুষজন লিখছে, 'আমি অনুক জায়গায় খেতে এসেছি, অমুক

জায়গায় ঘুরতে এসেছি।' আপনি কোথায় আছেন, কী করছেন, কী খাচ্ছেন তা দিয়ে আমার কী? এগুলো নিয়ে কার মাথাব্যাথা আছে?

অনেক বোন আছেন যারা আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখেন, এবং হীনমন্যতায় ভোগেন, দুঃখবোধ করেন। কিন্তু সত্যটা হলো আপনাকে যেমন দেখায়, যদি আপনি দেখতে তার চেয়ে অন্যরকম হতেন, তবে আপনাকে একটুও ভাল লাগত না। কেন জানেন? কারণ আপনাকে দুনিয়ার কেউ বানায়নি, আপনাকে বানিয়েছেন মহান আল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে আপনার মতো করে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যদি অন্যদের এটা পছন্দ না হয়, এটা তাদের সমস্যা। আপনি যেমন, আল্লাহ চান সে অবস্থাতেই আপনি তার আনুগত্য করুন। আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ চান আপনি যেন নিজেকে ঢেকে রাখেন। আল্লাহ চান যে সৌন্দর্য তিনি আপনাকে দিয়েছেন আপনি তার গোপনীয়তা বজায় রাখবেন। আপনার সৌন্দর্য শুধুমাত্র আল্লাহ, আপনার স্বামী এবং যাদের সামনে পর্দা ছাড়া আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন তাদের দেখার জন্য। তাহলে যিনি আপনাকে বানিয়েছেন, যিনি আপনার মালিক, সেই তিনিই বলে দিচ্ছেন, তিনি আপনার কাছে কী চান! তাই মানুষ কী বলল, মানুষ আপনাকে কীভাবে বিচার করল সেটা নিয়ে কেন এত দুশ্চিন্তা করছেন? কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার যে জগৎ দেখে আমরা অভ্যস্ত, সেই জগৎ আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। সেই চোখ ধাঁধানো আলোর জগৎ আয়নার সামনে নিজেকে ছোট করে দিচ্ছে, সত্যিকারের 'আমি'কেই আর ভালো লাগছে না মিথ্যের জগতে বসবাস করা অন্যদের দেখে।

যে ঘুম আর কোনোদিন ভাঙেনি

মুহাম্মাদ ইয়াকুব জেনেল, ১৮ বছরের যুবক। প্রতিদিনের মতো রাতে ঘুমিয়েছিল, সকালে তার সেই ঘুম আর ভাঙেনি। মাত্র ১৮ বছর। কোনো অসুখ নেই, স্বাস্থ্যবান এক যুবক। কোনো মানসিক চাপ বা অন্য কিছুই ছিল না, সামনে পড়ে ছিল পুরো জীবনটাই। কারো ধারণাতেও ছিল না, একটা ছেলে এভাবে ঘুমের ভেতর মারা যাবে।

আমার এখনো মনে আছে গতবছর একটা প্রোগ্রামে যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কখন তুমি নিজেকে আল্লাহর কাছাকাছি অনুভব করো? জবাবে সে বলেছিল,

> "এটা ব্যাখ্যাতীত এক ভালোবাসা। আল্লাহর প্রতি এই ভালোবাসা আপনি অনুভব করতে পারবেন যখন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে দুআ করবেন। অধিকাংশ সময়েই আপনি অনুভব করতে পারবেন, আপনার মধ্যে এই ইয়াকীন তৈরি হবে যে—আপনার দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল হবেই!"

এই অসাধারণ ছেলেটার সাথে আমার দেখা হয়েছিল যখন তার বয়স ১২ বছর। আমরা একটা ফান্ড কালেকশনের প্রোগ্রামে একত্রিত হয়েছিলাম। ডিনার টেবিলে খেতে বসে এই বালক ঘোষণা দিয়েছিল সে আমাদের ফান্ডে ৫০০০ ডলার দেবে। আমি মজা করে বলেছিলাম, ওহে বালক! তুমি ৫০০০ হাজার ডলার পাবে কোথায় শুনি! এই কথা শুনে সে আমার দিকে তাকাল। আমি অবাক হয়ে এই নিষ্পাপ ছেলেটার চেহারায় সেদিন ঈমানের এক নূর দেখতে পেলাম। দৃঢ়টার সাথে মুহাম্মাদ সেদিন আমাকে বলেছিল, আমি এত ডলার কোথা থেকে পাব সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

আমার মনে আছে সে ৫০০০ ডলার দেওয়ার ওয়াদা করেছিল, এবং এই ডলার সে জোগাড় করেও দিয়েছিল।

তার মৃত্যুর সংবাদ যখন শুনি তখন আমি হজ্জে, মিনায় অবস্থান করছিলাম। মুহাম্মাদের মৃত্যু সংবাদটা আমার জন্য প্রচণ্ড কষ্টের ছিল। সেই সাথে এই সত্যটুকু আরও একবার উপলব্ধি করলাম। আপনি কখনোই এই দুনিয়াকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবেন না, কারণ মৃত্যুর বাস্তবতা সবসময় আমাদের পিছন পিছন তাড়া করে যাচ্ছে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

> "আনন্দ ধ্বংসকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।" (ইবনু মাজাহ)

আমাদের এই জীবনে কোনোকিছুর গ্যারান্টি নেই, শুধু মৃত্যু ছাড়া। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বয়স, সুস্থ হোক আর অসুস্থ—সবার জন্য মৃত্যুর গ্যারান্টি আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

> "প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩: ১৮৫)

মৃত্যু আপনাকে খুঁজে নিবেই। আপনি মাটি ফুঁড়ে অন্ধকার গর্তে ঢুকে পড়ুন কিংবা উঁচু পর্বতশৃঙ্গে—মৃত্যু আসবেই। আলি ইবনু আবি তালিব (রা.) বলেছিলেন,

> "মানুষ ঘুমিয়ে আছে, তারা তখনই জেগে উঠবে—যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে।"

দুনিয়াকে ঘিরে আমরা স্বপ্নের জাল বুনে যাচ্ছি। নিজেদের কামনা বাসনা আর উচ্চাশার মোহাবিষ্ট হয়ে দুনিয়ার সত্যিকারের বাস্তবতা ভুলে বসে আছি। কিন্তু যখন মৃত্যু এসে হাজির হয়ে যায় ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কারণ এরপর আর ভুল শোধরানোর জন্য ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই।

এমন না যে আমরা সবাই মারা যাব—এই বিষয়টা আমাদের কাছে অজানা। কিন্তু আমরা একটা ফ্যান্টাসি জগতে বসবাস করি। জীবনে অনেক বড় হবো, ক্যারিয়ার গড়ব, গাড়ি-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান—ছবির ফ্রেমে সাজিয়ে রাখা সুন্দর একটা জীবন। এভাবে একটা সুখ-শান্তি-দুনিয়াময় জীবন কাটিয়ে অবশেষে মৃত্যু এসে আমাদেরকে একটা "হ্যাপি এন্ডিং" দিয়ে যাবে!

কিন্তু বাস্তবতা হলো আল্লাহ আমার আর আপনার প্ল্যান মতো চলে না। তিনিই সেই মহান সত্তা, যার প্ল্যানমতো আমরা চলি। তিনিই সবকিছুর মালিক, পরিকল্পনাকারী, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত গাছের একটা পাতাও নড়ে না।

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

> "সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ ও অক্ষম যে তার নফসের দাবির অনুসরণ করে আর আল্লাহ তাআলার নিকটে বৃথা আশা পোষণ করে। (ইবনু মাজাহ: ৪২৬০)

তাই নিজের সাথে নিজে সৎ হোন। কেননা, দিনশেষে আপনার কাজের থেকে কেউ যদি লাভবান হয়—সে আপনি নিজেই। আর আপনার গাফিলতি, দুনিয়ার মোহে জীবনটা বরবাদ করার থেকে যদি কারো ক্ষতি হয়—সেও আপনি নিজেই। তাই মৃত্যু আসার আগেই সেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিন। আজ, এখন, এই মুহূর্ত থেকেই...

কেন দুআ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে

মুসলিমদের উপর আপতিত অত্যাচার, নির্যাতনের সময় একটি রেডিমেইড সমাধান থাকে তাদের জন্য দুআ করা। সেই সাহাবিদের সময় থেকে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত দুআকে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এবং মুমিনের এই দুআর বদৌলতে কত বড় বড় জালিম ধরাশায়ী হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। নবিজি (সা.) বদরের প্রান্তরে আবেগতাড়িত হয়ে যে দুআ করেছিলেন, আসমান থেকে ফেরশতারা নেমে এসেছিল। এমনকি খোদ জালিমরাও মুমিনের দুআকে ভয় করত। খলিফা মু'তাসিমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাগদাদবাসীর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি যখন গিয়ে বলল, তোমার অত্যাচার বন্ধ করো নইলে আমরা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। খলিফা মু'তাসিম নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের মুখে যুদ্ধের কথা শুনে হেসে বলেছিল, তোমরা করবে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অথচ আমার কাছে আশি হাজার সশস্ত্র সৈন্য আছে। তখন প্রতিনিধি বলল, আমরা আপনার বিরুদ্ধে 'রাত্রি বেলার তীর' (তাহাজ্জুদ সালাতে আল্লাহর কাছে করা দুআ) দিয়ে যুদ্ধ করব। এই শুনে খলিফা মু'তাসিম বলেছিল, আমি এই ভয়ঙ্কর তীরের মুখোমুখি হতে পারব না।

এখন তো আমরা সব জানি, কোন দুআ পড়লে কি হবে, কোন সময় কি দুআ পড়বে হবে তা এখন মোবাইল এপের মাধ্যমে সবার হাতে হাতে। একটা আঙুলের টিপ দিলেই যখন যে দুআ চাই সেটা চোখের সামনে চলে আসে। প্রতি বছর হজ্জে গিয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ আল্লাহর কাছে কাঁদে। ফিলিস্তিনের জন্য কাঁদে, সিরিয়ার জন্য কাঁদে, মুসলিম উম্মাহর জন্য দুআ করে। আল্লাহ কি আমাদের দুআ শোনেন না? তিনি দেখেন না, এতগুলো মানুষ চোখের পানি ফেলছে? হ্যাঁ, তিনি শোনেন, দেখেন! তাহলে এই দুআ কোথায় যায়? এর কোনো প্রভাব নেই কেন?

এই দুআ বিফলে যাওয়ার প্রধান কারণ আমাদের মধ্য থেকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার আমল হারিয়ে যাওয়া। অন্যায়, অবিচার, ফাহিশা

কাজে চোখ সয়ে যাওয়া। হাদিসটা এসেছে জামে আত তিরমিযিতে, শাইখ আলবানি এটাকে সহিহ বলেছেন। নবিজি (সা.) বলেছেন,

‘তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের প্রতি শাস্তি নাযিল করবেন।’

কি সেই শাস্তি? নবিজি (সা.) বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করবে কিন্তু তিনি তা কবুল করবেন না।’

আর রহমান যদি কারো দুআ কবুল না করেন, তার জন্য এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে! সমস্ত মুসলিম উম্মাহ আজ এই শাস্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দুআ থাকার পরও আমরা কেন বিপদে পড়ে যাই, এর সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাইখ উমর আল আশকার (রহ.)। তিনি বলেন, ‘আল্লাহর সাহায্য চাওয়াটা যোদ্ধার হাতের তরবারির মতো। তার বাহু শক্তিশালী হলে এই তরবারি দিয়ে সে শত্রুকে হত্যা করতে পারবে। আর বাহু দুর্বল হলে ধারালো তরবারি দিয়েও শত্রুর গায়ে আঁচড় দেওয়া যায় না।’

তাই আমাদের উচিত নিজেদের পাপের ব্যাপারে ভীত হওয়া, নিজেদের নিষ্ক্রিয়তা, নীরবতা নিয়ে ভীত হওয়া। সেই অবস্থার কথা চিন্তা করে ভীত হওয়া, যখন আমরা আর রহমানের কাছে হাত তুলে দুআ করব, কিন্তু সেই দুআ কবুল করা হবে না। আমাদের উচিত আমাদের ঈমানকে মজবুত করা, যাতে আমাদের দুআ এতটা শক্তিশালী হয় যে তা আরশ মহলে গিয়ে পৌঁছায়। যে দুআর শক্তিতে আসমান থেকে আবাবিল পাখি নেমে আসবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

বলিউড— মুখোশের আড়ালে

"আজকের সব কিশোরী মেয়েরাই রুমের আয়নায় নিজেকে দেখে হয়তো ভাবে কেন সে দেখতে সিলেব্রেটিদের মতো নয়। শোনো হে মেয়ে, এটা আমাদের কারো আসল চেহারা নয়, আমরা কেউ এভাবেই ঘুম থেকে উঠি না, কোনো অভিনেত্রীই এমন না।

প্রতিটি পাবলিক এপেয়ারেন্সের আগে আমাকে ৯০ মিনিট মেকআপ চেয়ারে বসে থাকতে হয়। আমার চুল ঠিক করা আর মেকাপ ঠিক করার পেছনে ৩-৬ জন মানুষ কাজ করে। একজন পেশাদার বিউটিশিয়ান আমার নখ নিয়ে কাজ করে। প্রতি সপ্তাহে আমার আইব্রো প্লাগ করতে হয়, থ্রেডিং করতে হয়। মুখের দাগ আর ডার্ক স্পটগুলো আড়াল করার জন্য আমার শরীরে বিশেষ কসমেটিকের ব্যবহার হয়।

প্রতিদিন সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠে সাড়ে সাতটায় আমি জিমে চলে যাই। সেখানে ৯০ মিনিট ধরে এক্সারসাইজ করি, কখনও সন্ধ্যায় আবার কখনও ঘুমানোর আগেও এভাবে চলে। আমি কি খাব আর কি খাব না এটা ঠিক করার জন্য একজন ফুল টাইম লোক নিয়োগ করা আছে। যতটুকু আমি খাই, তার চেয়ে বেশি আইটেমের মেকআপ আমার মুখে লাগাতে হয়। আমার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ও আকর্ষনীয় পোশাকটি বাছাই করার জন্য একটি টীম সবসময় নিযুক্ত থাকে।

এতকিছুর পরও আমি যথেষ্ট নিখুঁত হতে পারি না। এরপর আছে ফটোশপের দারুণ সব কারসাজি।

একথা আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, যে অভিনেত্রীকে পর্দায় দেখে তুমি ঈর্ষায় ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছ, তাকে এরকম বানাতে একটা বিশাল টীম, কাড়ি কাড়ি টাকা, প্রচুর সময় দরকার হয়। এর কোনোকিছুই বাস্তব নয়, এটা এমন কিছু নয় যা তোমাকেও অর্জন করতে হবে। এটা এক আর্টিফিশিয়াল জগৎ।"

উপরের এই কথাগুলো এক বলিউড অভিনেত্রীর— যাদেরকে দেখে আজকালকার মেয়েরা ভাবে, ইশ! যদি তাদের মতো হতে পারতাম! রংচঙা সেলুলয়েডের পর্দায় শরীর দেখিয়ে বেড়ানো এই অভিনেত্রীরা যে মুখোশ পরে আছে, সেটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। মরীচিকার মতো আমরা কেবল তার পেছনে ছুটে মরি। অথচ মুখোশটা খুলে রাখলে আয়নায় দাঁড়িয়ে তাদের চেয়ে তোমার নিজেকে আরও বেশি সুন্দর মনে হবে, বিশ্বাস করো! তুমি নিজেকে দেখে আঁতকে উঠবে না।

চোখ ধাঁধানো আলোর সেই কৃত্রিম গ্ল্যামার তোমাদের সুখ কেড়ে নিচ্ছে! হীনমন্যতায়, ঈর্ষায়, তাদের মতো হতে চাওয়ার চেষ্টায়— নিজেদের সত্তাটাই ভুলে যাচ্ছ। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে ছোট করছ। অথচ চোখ ধাঁধানো আলোতে থাকা ঐ মুখোশওয়ালীদের নিজেদের বলতে কিছুই নেই। আর যাদের নিজের কোনো সত্তা নেই, মুখের উপর পরে থাকা মুখোশটা ছাড়া কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদের জন্য কিনা তোমরা নিজেদের জীবনটাকে ছোট করে দেখছ?[৫]

---

[৫] এটা এক বলিউড অভিনেত্রীর লেখা অবলম্বনে লেখা হয়েছে। —সাজিদ ইসলাম

প্রতিটি মানুষই স্পেশাল

আল্লাহ্ আমাদের যা দিলেন, এর বিনিময়ে আমরা কী করেছি? আল্লাহ আপনাকে কী জন্য সৃষ্টি করেছেন? খেল-তামাশার জন্য? আল্লাহ যেকোনো উদাহরণের ঊর্ধ্বে। শুধু বোঝানোর জন্য বলি। আপনার কি মনে হয় আল্লাহর কোনো কাজ করার ছিল না? তাঁর খুব বোরিং লাগছিল, তাই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন? বিনোদনের জন্য? ওয়াল্লাহি! এ আপনার ভাগ্য যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করে সম্মানিত করেছেন, আপনাকে মুসলিম বানিয়েছেন। আর আমরা ভুলে বসে আছি আমরা কেন এখানে। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করার জন্য, তাঁকে জানার জন্য, তাঁকে মানার জন্য, তাঁর কাছে চাওয়ার জন্য, অন্যদেরকে তাঁর দিকে ডাকার জন্য। আপনি কে, আগে কী পাপ করেছেন, দুনিয়া আপনার নামে কী বলে, এসব বিবেচ্য না। আপনি আল্লাহর কাছে স্পেশাল। আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। আপনিই সেই ব্যক্তি যে পৃথিবীকে পাল্টাতে পারেন। আল্লাহর সাহায্যে আপনি একাই পারেন দুনিয়াকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ ও ইসলামের আলোর দিকে নিয়ে যেতে। আপনার নিজের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। কেউ যেন আপনাকে পেছন থেকে টেনে ধরতে না পারে, আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে না পারে। আপনি স্পেশাল। কারণ স্বয়ং আল্লাহ আপনার স্রষ্টা।

আজ পৃথিবী সুখ খুঁজছে। অধিকার খুঁজছে। নারী অধিকার খুঁজছে। আমি আমার জীবনে এত আবর্জনা শুনিনি। তাদেরকে বলা হচ্ছে তারা যত পুরুষদের মতো হতে পারবে, তারা ততই স্বাধীন, ততই অধিকারসম্পন্ন। আল্লাহ্ বলছেন, না! আমি তোমাদের যেভাবে সৃষ্টি করেছি, যেভাবে আকৃতি দিয়েছি, সেভাবেই তুমি উত্তম। আমি এ অবস্থায়ই আমার বান্দা-বান্দীদের ভালোবাসি। আপনি যা নন, আল্লাহ চান না আপনি সেটা হোন। আপনি এমনিই স্পেশাল, আপনি মুসলিম, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাত।

চারপাশে দেখুন। উম্মাহর সাথে কী হচ্ছে, মুসলিমদের সাথে কী হচ্ছে। অন্য কোনো ধর্ম, অন্য কোনো দ্বীন, অন্য কোনো ব্যবস্থা, অন্য কোনো পথকে যদি এইভাবে আক্রমণ করা হতো, যেভাবে ইসলামকে আক্রমণ করা হয়, সেগুলো বহু যুগ আগেই ধ্বংস হয়ে যেত। অথচ ইসলাম এখনও মাথা উঁচু করে আছে, এখনও ছড়াচ্ছে। আল্লাহ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, ফেরেশতারা অপেক্ষা করছেন, এই উম্মাহ অপেক্ষা করছে যে, আপনি জেগে উঠে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবেন।

মন থেকে অহংকার ঝেড়ে ফেলুন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। ক্ষমার দিকে ফিরে আসুন। আপনি যদি কেবল বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ্ আপনার জন্য পাহাড়কে চলমান করে দিতেন। সেই একই আল্লাহ, যিনি মূসা (আ.) এর জন্য সাগর দ্বিখণ্ডিত করেছেন, যিনি রাসূল (সা.) এর জন্য চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন, যিনি উমর (রা.) জমিনে আঘাত করার পর ভূমিকম্প থামিয়ে দিয়েছেন। সেই একই আল্লাহ যিনি ঈসা (আ.) এর জন্য মৃতকে জীবিত করেছেন। যিনি নীল নদকে আবার প্রবাহিত করেছেন। সেই আল্লাহ আপনার পরবর্তী দুআর জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদেরকে সেই ঈসা (আ.), মূসা (আ.), মুহাম্মাদ (সা.), উমরর পদাঙ্ক ধরে চলতে হবে। তারপর দেখুন আল্লাহ তাঁদের জন্য যা করেছেন, আপনার জন্যও তা করে দিচ্ছেন। দেখুন আল্লাহ করেন কি না! আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। খাওয়া, ঘুমানো, যৌনক্রিয়া করা, গাড়ি হাঁকানো, কেবল এসবই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য না। আমরা পশু নই।

জীবন একটাই। এতে দ্বিতীয়বার ফিরে আসা যায় না। জীবনটা নিয়ে কিছু করুন। ভিড়ের মধ্যে সাধারণ আরেকটি চেহারাই কেবল থাকবেন না। আরেকটি সংখ্যাই কেবল হবেন না। এমন কেউ হোন যে মানবতার জন্য কোনো অবদান রাখে। এমন কেউ হোন, যে পার্থক্য গড়ে দেয়। আপনি কি হাশরের মাঠে নবিজি (সা.) এর সাথে থাকতে চান না? সত্যিই? আপনি কি সাহাবাদের সঙ্গী হতে চান না? যে জীবন আপনি পার করছেন, এর মাধ্যমে কি সত্যিই তা সম্ভব? তাঁরা যা কুরবানি করেছেন আর আপনি যা কুরবানি করেছেন, তারপরও কি তাঁদের সাথে আপনার একই স্তরের জান্নাতে থাকা সমীচীন? ওয়াল্লাহি, না।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠুন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। মসজিদের দিকে আসুন। কুরআনের দিকে আসুন। সালাতের দিকে আসুন। শুরু করুন, আজ থেকেই। আল্লাহ আপনার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

আপনার কাছে মনে হতে পারে দানের বাক্সে একশটা টাকা রেখে কী লাভ হয়। সেই টাকা পরে হয়তো কোনো কম্বল কেনার কাজে লাগে। সেই কম্বল নিয়ে কেউ শীতার্ত অঞ্চলে যায়। এই কম্বল দিয়ে কোনো অভাবী গা ঢাকে। আপনি মানবতার কাজে লাগলেন। চিন্তা করুন এমন মানুষের মর্যাদা কোথায়, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে! তাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে। যে মানুষের মনে আল্লাহর ভালোবাসা পুনরায় জাগিয়ে দেয়। আপনিও তাদের একজন হোন।

ওয়াল্লাহি! এই পৃথিবী আশা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ আশা হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি মুসলিমরাও। আর, মাঝেমাঝে মানুষকে কেবল আল্লাহর দিকে আহবান করলেই বিরাট পরিবর্তন আসে। কিন্তু কে করবে এটা? আপনাকেই করতে হবে। আপনার পরিচিত আরো হাজারটা মানুষের কাছে যান। তাদেরকে আল্লাহর দিকে ফেরত আসার জন্য ডাকুন। এই পৃথিবীতে বিজয় পাওয়া যাবে শুধু আল্লাহর দ্বীনের মাধ্যমে। মানুষ বলে, এখন আমরা অনেক কঠিন সময়ে বাস করি। এই সমস্যা, ওই ঝামেলা। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। রাসূল (সা.) এর সহিহ হাদিসে আছে, আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন এ দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ। সেটা যেই যুগেই হোক না কেন, আপনার নিজের বুঝ অনুযায়ী নয়, যেভাবে রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণ কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝেছিলেন, সেই বুঝ নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে থাকলে আপনি কখনওই পথভ্রষ্ট হবেন না। আপনার বুঝের কুরআন-সুন্নাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আর আল্লাহর রাসূল যেই কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে এসেছেন, তা মানবতার জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। এর মাধ্যমেই পরিবর্তন সম্ভব।

যে মৃত্যু মদিনাতেই লেখা ছিল

আমরা আমাদের ভাই খোদর কেঞ্জকে হারিয়েছি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দুই দিন আগেও আমি তার সাথে ছিলাম। একসাথেই আমরা মক্কায় ওমরাহ সম্পন্ন করেছি। এরপর সে মদিনায় চলে যায়। মসজিদে নববিতে জোহরের সালাতে সে ইমানের ঠিক পেছনেই ছিল। এরপরও প্রায় দুই ঘন্টা সেখানে সে কাটিয়েছে মহান রবের ইবাদাতে। দিনের শেষে হঠাৎ করে সে বুকে ব্যথা অনুভব করা শুরু করে। অবস্থা খারাপ হলে সে সেখানেই শুয়ে পড়ে। চারপাশে সে সময় তার পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ঘিরে ছিল। সময়টা তখন মাগরিবের সালাতের ঠিক আছে, মুয়াজ্জিনের আযান শুরু হয়েছে। সে কালিমা উচ্চারণ করতে থাকে, এবং সে অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মদিনাতেই তাঁর এই বান্দার জন্য মৃত্যুর সময়টা নির্ধারণ করে দেন।

মাত্রই ওমরাহ শেষ করে, নবিজির রওজায় দুই ঘন্টা ইবাদাতে কাটিয়ে, মাগরিবের ঠিক আগে, যখন আযান হচ্ছিল, শাহাদা উচ্চারণ করতে করতে আমাদের এই ভাই দুনিয়ার সাথে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বিদায় নিয়েছেন। বাকী কবস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে—যে বাকীর বাসিন্দাদের জন্য স্বয়ং নবিজি (সা.) দুআ করেছেন। কী সৌভাগ্যময় এক মৃত্যু! যে মৃত্যুকে সত্যিই ঈর্ষা করতে হয়।

তাঁর এই মৃত্যু ভাগ্যক্রমে ঘটে গেছে এমন কিন্তু না। আল্লাহর কসম আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি দেখেছি দিনের পর দিন সে এমন এক মৃত্যুর জন্য কী পরিশ্রমটাই না করেছে। আমি দেখেছি এমন এক মৃত্যুর জন্য সে কতটা আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে, এবং তাঁর এই আন্তরিক চাওয়া মহান আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে বিধায় আলাহ তাকে এমন এক মৃত্যু দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

বছরের পর বছর আমি তাকে দেখেছি মসজিদে জামাতের সাথে ফজরের সালাতে দাঁড়াতে। নামাজ শেষে সকাল ৯টা পর্যন্ত এই মানুষটা মসজিদের এক কোণায় বসে কুরআন মুখস্থ করার চেষ্টা করত। বছর খানেক আগে সে কুরআন মুখস্থ করার

মনস্থির করে। কুরআন মুখস্থ করার জন্য তাঁর চেষ্টা, তাঁর মেহনত ছিল দেখার মতো। তাঁর জন্য এটা খুব কঠিন ছিল। কিন্তু সে কখনো হাল ছাড়েনি। আমি দেখেছি পুরো এক সপ্তাহ জুড়ে সে কেবল একটা লাইন মুখস্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। একটা লাইন থেকে একটা আয়াত, এরপর অর্ধেক পৃষ্ঠা...এভাবে সে দিন রাত আল্লাহর কিতাব হিফয করার জন্য মেহনত করেছে। এরপর কুরআন হিফয করার এই ইস্পাত কঠিন স্বপ্ন নিয়ে সে সাউথ আফ্রিকা চলে যায়, সেখানে ফুলটাইম হিফযখানায় ভর্তি হয়ে নিজেকে পুরোপুরি কুরআনের পেছনে নিয়োজিত করে।

কয়েক মাস আগে তাঁর মা মারা গেছে। মায়ের শেষ সময়টুকুতে পুরোটা সময় সে তাঁর মায়ের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এমনকি মায়ের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়টাতেও।

মানুষের সুন্দর মৃত্যু হঠাৎ ভাগ্যক্রমে হয়ে যায় না। এটার জন্য আপনাকে মেহনত করতে হবে। আন্তরিকভাবে চাইতে হবে মহান আল্লাহর কাছে। যদি আপনি আন্তরিক হোন এবং দুনিয়ার এই জীবনে মহান আল্লাহর আনুগত্যে নিষ্ঠার সাথে দৃঢ় থাকেন, তবে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আপনাকেও এমন সম্মানের মৃত্যু দান করবেন, যেভাবে তিনি আমাদের ভাই খোদরকে দান করেছেন।

আসুন আমরা এবার নিজেদের প্রশ্ন করি, আমাদের দিনগুলো কীভাবে অতিবাহিত হচ্ছে? কীভাবে কেটে যাচ্ছে আমাদের রাতগুলো? কেমন মৃত্যুই বা আমাদের কপালে লেখা আছে? প্রশ্নগুলো নিজেই নিজেকে করুন। আপনার মৃত্যু কেমন হবে সেটা নির্ভর করছে আজকের দিনগুলো আপনি কীভাবে অতিবাহিত করছেন তার উপর। সুতরাং সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

জীবনের রঙ্গশালায়

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে চারপাশের মানুষগুলোকে দেখি। এদের দেখে মনে হয় জীবনের কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই। এরা এমনিই ফুর্তি করতে দুনিয়াতে এসেছে। যেন এই জীবন শুধুই একটি খেলা! আসলেই কি তাই? আমরা এখানে কেন এলাম? কেন আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করলেন? কেন আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি? ঘুম থেকে ওঠার পরের দুআটির অর্থ জানেন তো? "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদে মৃত্যু দান করার পর জীবিত করলেন। আর তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" অর্থাৎ গত রাতেও আপনারা সবাই মৃত ছিলেন। কে জীবন দিল আপনাকে? কেন দিল? আপনাকে মৃত্যু দেওয়ার পর আল্লাহ আবার জীবিত করলেন কেন? আর কেনইবা আমরা বলছি "আল্লাহর দিকেই আমরা সবাই ফিরে যাব?" আল্লাহ কি আপনাকে এজন্যই আজকে সকালে জীবন দিয়েছেন যে, আপনি অফিসে গিয়ে টাকা কামাই করে আল্লাহকে খাওয়াবেন? আল্লাহ কি আজ সকালে আপনাকে জীবন দিয়েছেন আপনার সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যাবার জন্যই? নাকি পরিবারের জন্য বাজার করে আনার জন্য? নাকি টাকা কামাই করে বাড়ি কেনার জন্য, আরো বড় বাড়ি কেনার জন্য বা নতুন মডেলের গাড়ি কেনার জন্য? বলছি না এসব হারাম, করাই যাবে না, কিন্তু শুধু এটাই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? এজন্যই কি আমরা বেঁচে আছি?

কয়বার আমরা একনিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রশ্ন করেছি যে, কেন আমরা বেঁচে আছি? উদ্দেশ্য কী? কারণটা কী? হে আল্লাহ! আপনি আমার কাছে কী চান? কেন আপনি আমাকে এই জীবন দিচ্ছেন, এই আবার মৃত্যু দিচ্ছেন, আবার জীবন, আবার মৃত্যু? বলা হয়ে থাকে, ঘুম হলো ছোট মৃত্যু আর মৃত্যু হলো বড় ঘুম। অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করেননি। কোনো কারণ ছাড়াই আমাদের জীবন দেননি, পৃথিবীতে পাঠাননি। আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট আয়াতে বলেছেন,

"আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার একমাত্র ইবাদাত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিনি।" (সুরাহ আয যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

আল্লাহ আপনাকে তাঁর দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ শুধু সালাত আদায় করা নয়। আল্লাহকে জানা, আল্লাহ্কে মানা, আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করা, অন্যদেরকে তাঁর পথে ডাকা—এই হলো আমাদের চাকরি। এজন্য আল্লাহ আজকে সকালে আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন, গত রাতে মৃত্যু দেওয়ার পর। কনসেপ্টটা মাঝেমাঝে বেশি চরম মনে হয়। তাহলে কি এখন আমরা গাড়ি, বাড়ি, টাকা-পয়সা সব ছেড়েছুড়ে দেব। না, আপনাকে কেউ এটা করতে বলছে না, কিন্তু আল্লাহ কোনো পরোয়াই করেন না আপনার ঘর কত বড়, আপনার কত টাকা আছে, সমাজে আপনার মর্যাদা কেমন। হোন আপনি রাজা, হোন আপনি সুইপার, আল্লাহ এর কোনো তোয়াক্কাই করেন না। আপনার যা-ই আছে, তা তিনিই আপনাকে দিয়েছেন। আপনার-আমার কী আছে গর্ব করার মতো? অনেকেই "মুই কী হনু রে" ভাব নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কে আপনি? শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন, মানুষ দুইবার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়েছে (একবার তার বাবার, আরেকবার তার মায়ের)।

এক ধার্মিক লোক ছিলেন। একবার তিনি বসা ছিলেন এক মজলিসে। পাশ দিয়ে যারাই যাচ্ছিল তাকে সম্মান দেখাচ্ছিল, সমীহ করছিল। কিছু সময় পর এক লোক তাকে পাত্তাই না দিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেলে। বসা লোকটি ধার্মিক, কিন্তু মানুষ তো! তার মনে কিছু একটা খচখচানি শুরু হলো। সবাই আমাকে সম্মান করছে, হাতে চুমু দিচ্ছে, আর এ কিনা এমনিই চলে গেল? তিনি সে লোকের কাছে গিয়ে বললেন, "ভাই, আপনি কি জানেন না আমি কে?" তিনি জবাব দিলেন, "ভাই, আমি আপনাকে আপনার নিজের চেয়ে বেশি ভালোমতো চিনি। আপনার শুরুটা ছিল একটা নুতফা, আর আপনার শেষটা হলো এক মৃত দেহ। আর এর মধ্যবর্তী সময়ে আপনি মল-মূত্রের একটি পাত্র।" ধার্মিক লোকটি বললেন, "আসলেই তুমি আমাকে আমার চেয়ে ভালোমতো চেনো।"

অহংকার শুধু আল্লাহর অধিকার। আপনার-আমার না। কখনও আল্লাহ আপনাকে চাকরি-ব্যবসা দেন। আপনি টাকা কামাই করেন। কৃতজ্ঞতা জানানোর বদলে আপনি কী করেন? "আরে এটা তো আমার কৃতিত্বের ফসল!" আপনার চিন্তাভাবনা যদি এমনই হয়, আর ভাবেন যে আখিরাতে খুব সুখে থাকবেন, আল্লাহর কসম, তাহলে আপনি বড় বিপদে আছেন।

কাকে বোকা বানাচ্ছেন? চাকরি পাওয়ার পর আপনি আবার তার দরজায় কড়া নেড়ে দেখেন, কী ভাই? মসজিদে আসছেন তো? জবাব আসলো, ভাইরে! বিরাট ফিতনার যুগ। বিয়ে করতে হবে। আমি তো রাতে ঘুমাতেই পারি না ফিতনায়। আচ্ছা কবে বিয়ে? এই তো...পছন্দের এক মেয়ে আছে। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেছে আরেক জায়গায়! পারিবারিক মর্যাদা যদি সমান না হয়, তাহলে তো প্রস্তাব মানবে না। এই তো আমার বড় ভাই বিয়ে করল কয়দিন আগে, খুব জাঁকজমক করে। আমারও তো ওরকম কিছু করতে হবে। তাই টাকা পয়সা একটু জমাই, তারপর না হয়...! শয়তানের সেই একই কৌশল, একই চাল, একই বিষ—বারবার আমরা এসবের শিকার হই। বারবার শয়তানের ধোঁকায় পরাস্ত হই।

আমাদের বামা-মায়েরাও আজ হারাম ব্যভিচারকে সন্তানদের জন্য সহজ বানিয়ে দিয়েছে, আর হালাল বিয়েকে বানিয়েছে 'মিশন ইম্পসিবল'। একজন পুরুষের ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হয়ে যায়, তারপরও তারা সিঙ্গেল থাকে। আচ্ছা একটা পুরুষের বয়স বত্রিশ বছর কিন্তু অবিবাহিত, সে রাতে কী করে বলে আপনি মনে করেন? কাকে বোকা বানাচ্ছেন? মনে হয় যেন কিছুই বোঝেন না! আপনার মেয়ের বয়স পচিশ-ছাব্বিশ পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা প্রতিটা লোককে আপনি সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ তারা আপনার একই ফ্যামিলি স্ট্যাটাসের না। বিয়েকে সহজ করার রাসূল (সা.) এর সেই সুন্নাহ কোথায়? আমি বলছি না ইন্টারনেট ব্যবহার করা খারাপ বা আপনার ছেলেমেয়ে খারাপ? কিন্তু সারারাত একাকী রেখে ইন্টারনেট হাতে তুলে দিয়ে আপনার ছেলেমেয়ের জন্য আপনি শয়তানের দরজা খুলে দিচ্ছেন। একটা না একটা সময় তার এমন জিনিসের দিকে চোখ পড়বেই, যেদিকে চোখ তোলা তার জন্য হারাম। একসময় এমন কাউকে টেক্সট করা হবে, যাকে টেক্সট করা উচিৎ না!

তাও শেষ পর্যন্ত যদি বিয়ে হয়ও, তাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই বিরাট জাঁকজমক করে। বিশাল নিকাহ অনুষ্ঠান। কী হয় সেই অনুষ্ঠানে? ভাইরে আমি আসলেই নারী-পুরুষের পর্দা ঠিক রেখে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সমাজের অবস্থা তো বোঝেনই...তাই একটু এমন করা লাগল আরকি! আল্লাহ জানেন আমার অন্তরে কী আছে। আমার মন পরিষ্কার!

সমাজের চাপে পড়ে আমরা বৈবাহিক জীবন শুরুই করলাম হারাম দিয়ে। আর আশা করছি যে তা হালাল পথে শেষ হবে। ভাই, আমি স্বীকার করছি আপনার টাকাপয়সা আছে, আপনি তা খরচ করতেই পারেন। কিন্তু অন্যদের উপর দয়া করুন। আপনার দেখাদেখি অন্যরাও এমন অপচয় করাকে আদর্শ ধরে নেয়।

তাদেরও এমন খরচ না করলে চলবেই না বলে ধরে নেয়। তাদের উপর একটু রহম করুন। তাদেরকে অন্তত বাঁচান। আপনি বলতে পারেন, আরে এইটুকু খরচ করা তো হালাল। হ্যাঁ বুঝলাম হালাল। আপনার সে সামর্থ্য আছে। কিন্তু আপনি তো সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন। অন্য অনেকে বাসা ভাড়ার টাকাটা দিতে পারে না, কিন্তু আপনাকে দেখে ভাবছে এত টাকা খরচ না করে বিয়ে করলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। তাই বাবা-মায়েদের বলছি, উম্মাতের প্রতি দয়া করুন। আপনাদের সন্তানদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ্ হলেন রাযযাক। আমরা খরচ কম করলে আল্লাহ্ আমাদের শাস্তি দেবেন না।

আবার সেই ভাইয়ের কাছে ফিরে যাই। তো বিশাল বিয়ে হলো। বিশাল খরচ। প্রচুর মিউজিক। প্রচুর হারাম। তো ভাই, এখন আপনি মসজিদে যেতে প্রস্তুত? ও আচ্ছা, হ্যাঁ শোনেন ভাই, এখনও হানিমুন বাকি আছে। সে নতুন ঘরে এসেছে, এখনও মানিয়ে উঠতে একটু সময় তো লাগবে। একটু সেন্সিটিভ না এখন বিষয়টা? একটু সময় দিন। আচ্ছা, কত সময় লাগবে আপনার? এই তো ছয় মাস-এক বছর। আচ্ছা এক বছর পরে আসছি!

এক বছর পর...ঠক ঠক ঠক...কে? ও! আরে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো মসজিদে চলেন। মসজিদ? ও আচ্ছা...ভাই আপনি সুসংবাদটা শোনেননি? না শুনিনি তো। কোন সুসংবাদ? আরে সে তো প্রেগনেন্ট! বোঝেনই তো। সে শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা, ওই সমস্যা। বমি হয়। ভাই, আমার একটু তার সাথে থাকা লাগে। এই ঝামেলাটা সেরে যাক, ইনশাআল্লাহ আমি আপনার সাথে আছি। আসব মসজিদে।

শয়তানের কৌশলের চক্র চলছেই। ষাট-সত্তর বছর বয়স হয়ে গেল। আপনি এখন বুড়ো। আর আপনার সন্তানেরা আপনাকে ধরে ধরে মসজিদে নিতে হয়। এখন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজা সুর হয়তো একটু ভিন্ন হতে পারে। ভাই, অমুক কোম্পানির সাথে একটা চুক্তির কাজ চলছে—এটা একটু শেষ হতে দেন—তারপর ইনশাআল্লাহ্! আমার এত টাকা হবে যে, আমি শুধু মসজিদে আসবই না, আমি নতুন মসজিদ তৈরি করে দেব ইনশাআল্লাহ।

আজ বড় কন্ট্র্যাক্ট—কাল জরুরি মিটিং—মিটিং এ আবার নারী কলিগ। আপনি সেখানে আল্লাহকে খুশি করার জন্য নারীর সাথে হাত মেলালেন। দেখেন ভাই, আমাদের তো অমুসলিম ভাইবোনদের প্রতি সদয় থাকতে হবে, তাই না? যাতে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সহজ হয়। তাই সে যাতে অস্বস্তিতে না পড়ে,

এজন্যই একটু হ্যান্ডশেক করতে হলো। আপনি গায়রে মাহরামের সাথে হাত মেলালেন আর ভাবছেন তা আল্লাহকে খুশি করে? অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন, গায়রে মাহরামকে স্পর্শ করার চেয়ে নিজের মাথায় লৌহ শলাকা গেঁথে দেওয়া বরং ভালো। আর আপনি ভাবছেন এসব করে ইনকাম করা টাকায় বরকত থাকবে?

আরে ভাই আমি ইনশাআল্লাহ তাওবা করে নেব—আল্লাহ গাফুরুর রাহীম। আপনি এত কট্টর কেন? এই দাড়িওয়ালা মোল্লাগুলোর সমস্যাটা কোথায়? দ্বীনকে সহজ করুন। এত জটিল বানাচ্ছেন কেন? এটা তো আমাদের বাপ-দাদার দ্বীন, তাই না? ইচ্ছেমতো এতে বাড়ানো কমানো যাবে। আপনার ব্যবসায়িক চুক্তির সুবিধার জন্য কি এখন কুরআনে সংশোধনী আনতে হবে?

তো কন্ট্র্যাক্ট হয়ে গেছে? হ্যাঁ, তবে একটু সময় লাগবে। আচ্ছা কত? এই তো ছয় মাস-এক বছর। আচ্ছা গেল—এখন কী অবস্থা? ভাই, আপনি তো জানেনই না অবস্থা। তারা এখন এত খুশি, তারা আরেকটা কন্ট্র্যাক্ট করতে চাচ্ছে। বিরাট লাভ হবে। এটা হয়ে গেলে আমি দুইটা মসজিদ বানিয়ে দেব, যেখানেই হোক।

দেখুন আমাদের অবস্থা। এমন সব হারাম কাজ করে সফল হওয়া মুসলিমের সংখ্যা কত? অনেক ক্লীন শেইভড মুসলিম আছে মিলিয়নেয়ার। বছরে বছরে হজ্ব, ওমরাহ, মাশাআল্লাহ। এটাই শয়তানের চক্র! আমাদের জীবনের মুভির মতো স্ক্রিপ্টের শেষ কোথায়? কী অবস্থা আমাদের? কী হবে আমাদের পরিণতি? ষাট-সত্তর বছর কাটালাম আল্লাহকে ভুলে। আর এখন শেষ সময়ে শয়তান তার পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে আসবে, আর আমরা ভাবছি আমরা বেঁচে যাব। আমি এই ধোঁকাগুলো টের পাচ্ছি কারণ আমিও একসময় এরকম বোকা ছিলাম। এই ধোঁকার চক্রের ভেতর দিয়ে আমিও গিয়েছি।

আমাদের এখন গড় বয়স কত হবে? ত্রিশ? চল্লিশ? বা এর কিছু বেশি? আপনি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না এতগুলো বছর কী করেছেন। আপনি নিজেই নিজের এই ত্রিশ-চল্লিশ বছরের জীবনটার দিকে তাকান। উমর (রা.) বলেছেন, তোমাকে বিচার করার আগে নিজেই নিজেকে বিচার কর। নিজের জীবনের দিকে তাকান আর যাচাই করুন জীবনটা কীভাবে কেটেছে। কী অর্জন করেছেন? কী আমল? যেটা দিয়ে আপনি এতই আত্মবিশ্বাসী যে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে সেটা পেশ করে বলতে পারবেন, হে আল্লাহ! আমাকে এই আমলের দ্বারা বিচার করুন?

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) জীবনের শেষ প্রান্তে কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর বলতেন, আল্লাহর কসম! যেই জিনিস আমাকে তোমায় হিফয করা হতে বাধা দিয়েছে তা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। সালাহউদ্দীন আইউবি (রহ.) কখনও হজ্ব করেননি। জেরুজালেম জয় করেছেন, কিন্তু হজ্ব করা হয়নি। তিনি শেষ জীবনে বলতেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছাড়া আর কোনোকিছুই আমাকে হজ্ব করা থেকে বাধা দেয়নি।

এখন নিজেদের প্রশ্ন করে দেখি আপনি-আমি কী বলব? কীসে আমাদের সালাত থেকে, কুরআন থেকে, সুন্নাহ থেকে বাধা দিল? চাকরি? ব্যবসা? নারী? গাড়ি? সন্তান? মদ? কীসে বাধা দিল? আপনি আমাকে বোকা বানাতে পারেন, আমি আপনাকে বোকা বানাতে পারি। কিন্তু নিজেকে নিজে অন্তত বোকা বানাবেন না। আমাদের সবাই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, একদিন হুট করে সেই সময়টা চলেও আসবে। আমাদের প্রত্যেকে আল্লাহর সামনে একাকী দাঁড়াব। সেদিন আপনার ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, শাইখ কেউ আপনার সাথে থাকবে না। আপনি একা দাঁড়াবেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, কবরে মুনকার নাকির যখন আসবেন, তাঁদের কণ্ঠ হবে বজ্রের মতো, চোখ হবে বিদ্যুতের মতো। অপ্রত্যাশিতভাবে কখনো বাজ পড়ার আওয়াজ শুনেছেন? বুড়োরা কেঁপে ওঠে, বাচ্চারা কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। চিন্তা করুন আপনি কবরে, মাটির ছয় ফীট নিচে, একা, কেউ নেই, অন্ধকার। এমন সময় দুই ফেরেশতা এলেন বিশাল বিশাল হাতুড়ি নিয়ে। আর তাঁরা কথা বলতে শুরু করলেন বাজ পড়ার মতো শব্দে। তাঁরা আপনাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব্ব কে? তোমার নবি কে? তোমার দ্বীন কী? কীভাবে উত্তর দেবেন সেদিন? সাহস আছে? ঈমান, আমলের জোর আছে?

একটি কাহিনী আছে। আমি জানি না এটা সহিহ কি না। রাসূল (সা.) যখন মুনকার নাকিরের কথা বললেন, উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁরা যখন আমাকে প্রশ্ন করবে, তখন কি আমি সজ্ঞান থাকব? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা.) মাথা নাড়লেন, তারপর চলে যেতে লাগলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আমি যদি সজ্ঞান থাকি তাহলে সমস্যা নেই। তারপর জিবরিল (আ.) ওই সময় উমরের কী অবস্থা হবে তা বর্ণনা করা শুরু করলেন। তিনি (সা.) উমরকে ডাকিয়ে এনে বললেন, আমাকে এই মাত্র জানানো হলো, যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমার রব কে, তখন তুমি বলবে আমার রব আল্লাহ, তোমাদের রব কে? এরপর তুমি বলবে আমার নবি মুহাম্মাদ (সা.), তোমাদের নবি কে? আমার দ্বীন ইসলাম, তোমাদের দ্বীন কী? ফেরেশতারা চলে যাওয়ার

সময় ভাববেন আমাদেরকে পাঠানো হলো একে প্রশ্ন করতে, নাকি একে পাঠানো হলো আমাদেরকে প্রশ্ন করতে? এই সেই পুরুষ, তিনি ইসলামকে এমনভাবে মেনেছেন, নবিকে এমনভাবে মেনেছেন, আল্লাহর আনুগত্য এমনভাবে করেছেন, সেই ভয়ঙ্কর সময়েও তাই তাঁর ঈমানের জোর এমনই হবে।

আমি যখন ছোট ছিলাম, এই ফেরেশতাদের কথা শুনে এত ভয় পেতাম যে উত্তরগুলো কাগজে লিখে বারবার মুখস্থ করতে থাকতাম। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী করছ? আমি বললাম, আমি কবরের তিনটা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করছি। সে বলল, তুমি কি জানো না মৃত মানুষ কথা বলে না? তাহলে কোন অঙ্গ এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে? হৃদয়—আর হৃদয় কখনও মিথ্যা বলে না। হৃদয় যদি জানে আপনি টাকার চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসেন, হৃদয় এ কথা জানবে আপনার কাজ দেখে। আর যদি টাকাকে বেশি ভালোবাসেন, ফেরেশতারা প্রশ্ন করতে আসলে সে উত্তর দেবে, আমার রব টাকা। আল্লাহ বলেছেন, আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদাত করার জন্য? ইবাদাত কী? দাসত্ব। আল্লাহর যেদিকে হাঁটতে বলেন, আমরা সেদিকে হাঁটি; আল্লাহ যেদিকে দৌড়াতে বলেন, আমরা সেদিকে দৌড়াই—এটাই ইবাদাত। কোনো মুসলিমকে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা ভাই, আপনি কার ইবাদাত করেন? আল্লাহর, নাকি টাকার? সে বলবে, আস্তাগফিরুল্লাহ! আল্লাহরই তো ইবাদাত করব।

ফজরের সালাতের সময় মুয়াযযিন আযান দেন। আমরা আযানকে শুধু সালাতের ওয়াক্তের ঘোষণা মনে করি। আচ্ছা মুয়াযযিন কি বলেন, দাখালা ওয়াক্তিল ফাজর? নাকি হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ? তিনি আপনাকে মসজিদে গিয়ে সালাত পড়ার আহ্বান করছেন। কোনো মুয়াযযিন কি এভাবে ঘোষণা দেয়, সম্মানিত এলাকাবাসী! সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে অমুক সালাতের ওয়াক্ত হইয়াছে। কাজেই যখনই সময় পান, বস যদি ছুটি দেয়, স্ত্রী যদি পারমিশন দেয়, দয়া করে সালাতটা পড়ে নিয়েন। ঘোষণাটি শেষ হলো। ধন্যবাদ! এমন কি? না! আল্লাহ আপনাকে ফালাহ—সাফল্যের দিকে ডাকছেন। আমরা ফজরের সময় কোথায় থাকি? নাক ডাকি। অথচ সাতটা-আটটায় উঠে কাজকর্মে তো ঠিকই যান। তো কার ইবাদাত করছেন? তাহলে কবরে এই হৃদয় কি নিজের রব হিসেবে আল্লাহর নাম বলবে, না টাকার নাম বলবে?

এভাবে কাকে ধোঁকা দিচ্ছেন? আল্লাহকে? না, ধোঁকা দিচ্ছেন নিজেকে। ষাট-সত্তর বছরের জীবন মাত্র। এখানে এই গান-বাজনা-হারাম টাকায় সময় নষ্ট করাটা দুঃখজনক। রাসূল (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার জীবনে আমি এক মুসাফিরের মতো।

যে পথ চলতে গিয়ে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর আবার পথ চলতে শুরু করল। আমরা যে গাছাড়া ভাব নিয়ে জীবনযাপন করছি সেখান থেকে জেগে উঠতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। দুনিয়ার কাজে সাড়া দেওয়ার আগে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে। আমি বলছি না আপনাকে রাতারাতি বিরাট মাওলানা হয়ে যাতে হবে। কিন্তু আমাদের অনেক ছোট ছোট পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে।

এখন অনেকেই হয়তো ভাবছেন কী দিয়ে শুরু করা যায়। আপনার দিন শুরু করুন ফজরের সালাত দিয়ে। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদাত করল। অতএব, আমি মসজিদে গিয়ে দিন শুরু করব। ইশার সালাতে মসজিদে গিয়ে দিন শেষ করব। আমার দিন যদি ঠিকভাবে শুরু হয়, ঠিকভাবে শেষ হয়, তাহলে এর মাঝে যা আছে, তা অবশ্যই ঠিক হবে। আপনি যদি ফজর দিয়ে দিন শুরু করেন, ইশা দিয়ে শেষ করেন, তাহলে আপনার জীবনটাই আবর্তিত হচ্ছে সালাতকে ঘিরে। মনে করুন রাতে একটি বিয়ের দাওয়াত আছে। ইশার সালাতের ঠিক আধাঘণ্টা আগে। আপনি কী করবেন? আধা ঘণ্টা দেরি করে যাবেন! এভাবে যদি চলতে থাকে সেখা যাবে সমাজে একদিন বিয়ের দাওয়াতের সময়ই ঠিক করা হবে ইশার সালাতের পর। কারণ ইশার আগে তো কেউ আসেই না! এভাবেই সমাজ পরিবর্তন হয়। একজন মানুষ দিয়েই তা শুরু হয়। অতএব, মসজিদে ফজর, মসজিদে ইশা। মগরিবও হলে তো কথাই নেই। রাসূল (সা.) এর এক সহিহ হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করে তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করে আল্লাহর যিকির করে, তারপর দুই রাকআত ইশরাকের সালাত আদায় করে, সে একটি কবুল হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব পাবে।

ফজরের পর কতক্ষণ বসা লাগে তাহলে? এক ঘণ্টা? এখানে তো বেশিরভাগই হানাফি মাযহাবের মসজিদ, এমনিতেই ফজর একটু দেরি করে পড়া হবে। বড়জোর ২০-৩০ মিনিট বসতে হবে। অনেকে নাকি কুরআন পড়ার সময় পায় না। এই ২০-৩০ মিনিট কুরআন পড়ুন। চিন্তা করুন প্রতিদিন ২০-৩০ মিনিট কুরআন পড়লে এক বছর পর আপনার কুরআনের জ্ঞান কত বেড়ে যাবে! রামাদানে কয় খতম দিতে পারবেন! হজ্ব আর ওমরার সাওয়াব আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে প্রত্যেক সকালে। আর আমরা নাক ডাকছি। আর মুনাজাতে কান্নাকাটি করি, হে আল্লাহ! উম্মাতের জন্য নুসরাহ আসে না কেন?

ভাবুন তো আপনি ফজর পড়ে, ইশরাক পড়ে দিন শুরু করলেন। আর সেদিন আপনি যদি মারা যান, তাহলে আপনার হৃদয় কি সাক্ষ্য দেবে না যে আল্লাহ্‌তার রব? সেই সাথে নফল ইবাদাত বৃদ্ধি করুন। যেমন প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পড়া। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে এই আমল করবে, তার ও জান্নাতের মাঝে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না। এছাড়া যে প্রতি ফরয সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানআল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়ে, তারপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির' বলে শেষ করে, তার গুনাহ সাগরের ফেনা পরিমাণ হলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আজকাল তো আমরা ঠাসঠাস সালাম ফিরিয়েই শেষ করে ফেলি। এরকম ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো আনলেই অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়।

কবরের তিন শত্রু, তিন বন্ধু

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যে বিষয়টা সুনিশ্চিত সেটা হলো মৃত্যু। ধনী-গরীব, কালো-সাদা, রাজা-প্রজা সবাইকেই মরতে হবে। এই দুনিয়াতে মৃত্যুকে কেউ কখনো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। আমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, আগামীকাল সেটা মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে। পরিবার, সন্তান, স্ত্রী, পিতা-মাতা—আগামীকাল সকালে তাদের দেখতে পাব এর কোনো গ্যারান্টি নেই। মোটা বেতনের চাকরী, আলিশান বাড়ি, সুন্দর স্বাস্থ্য—হঠাৎ করে অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। এর কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়, কোনো গ্যারান্টি নেই। দিনশেষে আমাদের সবাইকেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, আর সেদিনের জন্য আমরা কি সঞ্চয় করেছি এটাই গুরুত্বপূর্ণ।

একবার এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (সা.) সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকটিকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সেদিনের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এখানে যে শিক্ষাটা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো, কিয়ামত তো নিশ্চিত, এটা হবেই, তাই এটা কবে হবে সেটা জেনে ফায়দা নেই, বরং তুমি সেদিনের জন্য কী সঞ্চয় করেছ, আল্লাহর সামনে কী নিয়ে উপস্থিত হবে সেদিকে মন দাও।

মৃত্যুর ব্যাপারটাও এমনই। এটা নিশ্চিত, কিন্তু আমরা জানি না ঠিক কখন হবে, যেকোনো মুহূর্তে হতে পারে। তাই এক্ষেত্রেও মূল প্রশ্ন মৃত্যু কখন হবে সেটা নয়, বরং মৃত্যুর জন্য আমার প্রস্তুতি কী, মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমার সঞ্চয় কী—এটাই মূল প্রশ্ন।

মৃত্যুর পর মানুষের প্রথম পরীক্ষাটা শুরু হয় কবরে। এখানেই মূলত নির্ধারিত হয়ে যায়, কার ভাগ্যে কি আছে। কবরে যাওয়ার পর তিনটা দুশ্চিন্তা এসে মানুষকে গ্রাস

করে নেয়, সেই সাথে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করতে তিনটা প্রশান্তি এসে হাজির হয়ে যায়।

১। কবরের সংকীর্ণতা।

কবর থাকে একেবারে সংকীর্ণ। বাইরে থেকে যখন আমরা দেখি তখনই আমরা বুঝি, এই জায়গায় কেউ থাকার মতো না। কোনোমতে লাশের শরীরটা রাখা যায়। পাপাচারীর জন্য এই সংকীর্ণ কবর আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু মুমিনের জন্য কবরে রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। তাঁর জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির জন্য কবরকে এভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, যার দূরত্ব আমার চোখ যতদূর দেখা যায় তার সমান। একজন ব্যক্তি তাঁর চোখে যতদূর দেখতে পায়, এই ছোট্ট কবরটি মুমিনের জন্য ঠিক ততটা প্রশস্ত হয়ে যায়।

২। কবরের অন্ধকার।

কবরে যাওয়ার পর আরেকটি দুশ্চিন্তা হলো এর অন্ধকার। দুনিয়ায় সামন্য কিছুক্ষণ যদি কাউকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়, সে হয়তো ভয়েই মারা যাবে। তাহলে চিন্তা করুন কবরের অন্ধকার কতটা ভয়াবহ। কিন্তু মুমিন বান্দার জন্য এখানেও বিশেষ সুবিধা আছে। কবর সেদিন তাঁর জন্য নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে। কি সেই নূর, কি সেই বিশেষ আলো? এই নূর হলো দুনিয়াতে তাঁর সালাত। সালাত সেদিন অন্ধকার কবরকে আলোকিত করে রাখবে। আর যারা দুনিয়াতে সালাতকে অবহেলা করেছে, ত্যাগ করেছে, তাদের জন্য কবর সেদিন ভয়াবহ অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। এবং সেখানে থাকবে কঠিন আযাব। সহিহ বুখারিতে এসেছে, রাসূল (সা.) একবার স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আরেক ব্যক্তি একটি পাথর নিয়ে সেই ব্যক্তির মাথায় আঘাত করছে, পাথরের আঘাতে মাথা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সেই চুরমার হওয়া মাথা আবার জোড়া লাগছে, ঐ ব্যক্তি পাথরটি কুড়িয়ে এনে আবার মাথা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। এবং এভাবেই চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তির এমন পরিণতি কী কারণে? সঙ্গী ফেরেশতা জবাব দিল, এই ব্যক্তি কুরআন পড়ত, কিন্তু তার উপর আমল করত না, এবং ফরয সালাত ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

কত মানুষ আজ এভাবে নিশ্চন্তে সালাত ছেড়ে দিয়ে, বে-নামাজী তকমা নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবরে কি অবস্থা হবে এই নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। কে সেদিন তাদের অন্ধকার কবরে আলো জ্বালাবে?

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, বান্দা দুইবার আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। একবার সালাতে, দ্বিতীয়বার হাশরের মাঠে। দুনিয়ার সালাতে যে ঠিকঠাক আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য হাশরের মাঠে দাঁড়ানোটা সহজ করে দেওয়া হবে। আর দুনিয়ার জীবনে যারা সালাত ঠিক করেনি, অবহেলা করেছে, ছেড়ে দিয়েছে, হাশরের মাঠে দাঁড়ানোটা সেদিন তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

শুধু তাই নয় সর্বপ্রথম হাশরের মাঠে হিসেব নেওয়া হবে সালাতের। এই হিসেবে যে পার পেয়ে যাবে, তার জন্য বাকি হিসেব সহজ হয়ে যাবে। আর দুনিয়ার জীবনে যারা সালাত ত্যাগ করেছে, তাদের হাশর হবে ফিরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

> "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাজত করল, সালাত কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসিলা হবে। আর যে সালাতের হিফাজত করল না, সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসিলা হবে না এবং ফিরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে তার হাশর হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

আর জাহান্নামীদের মধ্যেও এমন লোক থাকবে যারা সালাত ত্যাগ করার কারণে জাহান্নামী হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে এসব জাহান্নামীদের সাথে জান্নাতিদের একটি কথোপকথন উল্লেখ করেছেন,

> "তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না।" (সূরাহ মুদ্দাসির, ৪২-৪৩)

সুতরাং সালাতই সেই মহান বন্ধু, যে কবর থেকে শুরু করে, হাশরের ময়দান সব জায়গায় আমাদেরকে রক্ষা করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে।

৩। কবরের একাকীত্ব।

তৃতীয় যে শত্রু কবরে এসে আমাদেরকে আক্রমণ করবে সেটা হলো একাকীত্ব। পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই সেখানে। কিন্তু মুমিন বান্দারের জন্য সেখানে সঙ্গীর ব্যবস্থা থাকবে। সুন্দর চেহারা, উত্তম পোশাক, মনভুলানো সুগন্ধি নিয়ে একজন মুমিন বান্দাকে সঙ্গ দিতে কবরে হাজির হবে। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কে তুমি? সে জাবাবে বলবে, আমি হলাম দুনিয়াতে আপনার ভালো আমল, আজ আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে চলে এসেছি এবং পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত আমি আপনার সাথে থাকব।

এভাবেই কবর কারো জন্য আযাবের কারণ হবে, আর কারো জন্য প্রশান্তি। কারো জন্য কবর হবে এক খণ্ড জাহান্নাম, আর কারো জন্য এক টুকরো জান্নাত। আমরা দুনিয়াতে যে জীবন কাটাচ্ছি, এর প্রেক্ষিতে এবার নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমাদের সাথে কবর কেমন আচরণ করতে যাচ্ছে? উত্তরটা আমাদের সবার জানা, তাই না?

এয়ারপোর্ট ট্রানজিট

রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা)-এর সাথে ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের ডাকনাম ছিল মাজনুনুস সুন্নাহ—সুন্নাতের পাগল। তিনি এতই কঠিনভাবে সুন্নাহ মানতেন যে, একদিন তিনি একদল লোকের সাথে হেঁটে যাচ্ছিলেন। একটা জায়গায় এসে মাথাটা একটু নিচু করে আবার সোজা হলেন। সাথের লোকেরা ভাবল, হয়েছে কী এই লোকের? তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমার মনে পড়ছে অনেক বছর আগে রাসূল (সা.) এই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এখানে একটা গাছ ছিল, তার একটা শাখা এত নিচু হয়ে ছিল যে, রাসূল (সা.) মাথা ঝুঁকিয়ে সেটা পার হলেন। আমি এই জায়গা পার করার সময় রাসূল (সা.)-এর সেই কাজটি অনুকরণ না করে পার হতে চাইনি, যদিও গাছটা এখন আর নেই। তিনি পদে পদে রাসূলকে অনুসরণ করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের যখন অল্প বয়স, রাসূল (সা.) একবার তাঁর কাঁধ শক্ত করে ধরলেন। আরবদের সংস্কৃতিতে এভাবে কাঁধ ধরার অর্থ, আমি এখন তোমাকে যেটা বলছে চলেছি, সেটা মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো রাসূল (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের কাঁধ ধরে বলছেন, আব্দুল্লাহ! এই দুনিয়ায় একজন অপরিচিত মুসাফিরের মতো বাস করো। আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, সেইদিন থেকে আমি যখনই সকালে উপনীত হতাম, তখন আর সন্ধ্যায় উপনীত হওয়ার আশা করতাম না। আল্লাহ যদি আমাকে সন্ধ্যায় উপনীত করতেন, তাহলে আল্লাহর কসম, আমি সকাল দেখতে পাওয়ার আশা করতাম না।

রাসূল (সা.) মুসাফিরের উপমা দিয়েছেন। কোথাও সফরে যাওয়ার সময় আপনি আপনার সাথে করে কী নিয়ে যান? আপনি আপনার ঘরবাড়ি মাথায় করে নেন? কেবল একটা ব্যাগ নিয়ে যান। ছোট ব্যাগে না হলে হয়তো বড় কোনো ব্যাগ নেন। অথবা হয়তো আপনার আন্টি আপনাকে কোনো পুঁটলি গছিয়ে দিয়েছেন সেখানে গিয়ে আপনার আঙ্কেলের কাছে পৌঁছে দিতে। ব্যস—এছাড়া আপনি তেমন কিছু

নেন না। খালি দরকারি জিনিসগুলো। কোনো ঠান্ডা জায়গায় যেতে হলে বড়জোর একটা সোয়েটার নেন। আপনি নিশ্চয় পুরো ওয়ার্ড্রোব তুলে নিয়ে যান না। রাসূল (সা.) বলেছেন, দুনিয়াতেও আপনার এভাবেই বাস করা উচিৎ। শুধু দরকারি জিনিসগুলো সাথে নেবেন, আর কিচ্ছু না।

রাসুল (সা.) নিজের ব্যাপারে বলছেন, এই দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক। এখানে আমি এক মুসাফিরের মতো। যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল, তারপর উঠে আবার পথ চলতে শুরু করল। এই যে বিশ্রাম নেওয়ার সময়টুকু, এটুকুই দুনিয়া।

আপনি বিদেশে যেতে হলে এয়ারপোর্টে ট্রানজিটে কতক্ষণ অপেক্ষা করেন? বড়জোর তিন-চার ঘণ্টা? রাসূল (সা.) এটাকেই দুনিয়া বলেছেন। ভাবুন এই পৃথিবীটা শাহজালাল বিমানবন্দর। আপনার গন্তব্য কোনো একটা দেশ। মাঝে কিছুক্ষণ বিমান বন্দরে থাকতে হয়েছে। এটাই দুনিয়া। আমাদের সবার গন্তব্য কোথায়? জান্নাত। আচ্ছা চিন্তা করুন শাহজালাল বিমানবন্দরে বসে আপনি আর আমি প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি ঘড়ি দেখে বললেন, ফ্লাইটের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। আমাদেরকে অত নাম্বার গেটে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি বললাম, আরে এখনই যাবেন? এই এয়ারপোর্টটা দেখেন, কত সুন্দর! কী সুন্দর দোকান-পাট। উফ! আমার ইচ্ছে করছে এখানে একটা বাড়ি করি। তারপর বিয়েশাদি করে এখানেই সেটল হয়ে যাই। আপনি নিশ্চয় আমাকে বলবেন, ভাই, পাগল হয়েছেন? আমাদের ফ্লাইট আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আর আপনি এসব বলছেন। এসব শুনে হয়তো হাসি পাচ্ছে। কিন্তু দুনিয়াতে আমরা এই জিনিসই করছি। অথচ ট্রানজিটে তিন-চার ঘণ্টা সময় আপনার কী করা উচিৎ? বড়জোর হালকা খাবারদাবার খাবেন, টয়লেটে যাবেন, তারপর সময়মতো গিয়ে ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করবেন। এর চেয়ে বেশি কিছু না। ওয়াল্লাহি, চার ঘণ্টা অনেক লম্বা সময়। আমাদের কারো চার মিনিট বাঁচার গ্যারান্টি নেই। অথচ এই দুনিয়াকে আমরা ঘর বানিয়ে ফেলছি। আল্লাহ দুনিয়াকে বানিয়েছেনই এমনভাবে যে, এটা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহর কসম, আপনার যত সম্পত্তিই থাকুক না কেন, আপনি কখনওই তৃপ্ত হবেন না। আল্লাহ একে বানিয়েছেনই এভাবে। জান্নাত ছাড়া আর কোথাও সন্তুষ্ট হবেন না।

আমরা বিয়ে করি, কাজ করি, ঘর করি, গাড়ি কিনি, পরিবারকে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিই। এগুলো সবই হালাল। জীবনে এগুলোর প্রয়োজন আছে। কিন্তু দ্বীনকে জবাই করার বিনিময়ে নয়। কক্ষণো দুনিয়াকে দ্বীনের আগে স্থান দেওয়া যাবে না।

আমাদের কত মুসলিম ভাই কাজের কারণে সালাত মিস করে? কারণ বস যেতে দেন না। অথবা ইউনিভার্সিটির জন্য। তারা ক্লাসের জন্য সালাত মিস করে। কারণ টিচার যেতে দেন না। মুসলিম, অথচ এমন চাকরিতে ঢুকছে যেখানে দাড়ি রাখতে দেয় না। মনে মনে সে ঠিকই চায় দাড়ি রাখতে। যারা রাখতে চায় না, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা রাখতে চায়, তাদের অনেকেই চাকরির দোহাই দেয়। ভাই দেখেন, আমি এমন অমন চাকরি করি। এখানে এটা ঠিক মানায় না। আমরা কি সত্যিই আল্লাহর ইবাদাত করি, না চাকরির? আমরা যখন বলি কেউ টাকার ইবাদাত করে, তখন মানুষ ভাবে সে মনে হয় মেঝেতে একটা একশ টাকার নোট রেখে তাতে সিজদা দেয়। নাহ! ইবাদাত করা মানে আনুগত্য করা। বস আপনাকে বলেছেন সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠতে, আল্লাহ বলেছেন সাড়ে পাঁচটায় উঠতে। আপনি সাতটায় উঠলেন। কার আনুগত্য করলেন? আল্লাহ বলেছেন সালাত পড়ো, টিচার বললেন সালাত পড়ো না। আপনি পড়লেন না। কার আনুগত্য করলেন? আল্লাহর, না দুনিয়ার? এটাই আজ আমাদের বাস্তবতা।

এই দুনিয়ার কিছুই আপনি নেবেন না। আপনে যে-ই হোন না কেন, আপনার যত বাড়িই থাকুক না কেন। যত কিছু ইচ্ছা ভোগ করে নিন, কিন্তু একদিন আপনি মারাই যাবেন। যাকে ইচ্ছা ভালোবাসুন, কিন্তু একদিন আপনি পৃথক হবেনই। যা ইচ্ছা জমা করুন, কিন্তু একদিন আপনি আল্লাহর কাছে এর হিসাব দিতেই হবে।

দুনিয়াকে এর বাস্তবতা স্বীকার করে নিন। আজ আপনি যুবক শক্তিশালী, কাল হাঁটুতে ব্যথা, পাকা চুল। পরশু আপনি নেই। আলিমগণ একটি চমৎকার উপমা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, দ্বীনকে মনে করুন একটি সূর্য। আর আপনার ছায়া হলো দুনিয়া। আপনি সূর্যকে পেছনে রাখলে, মানে দ্বীনকে পেছনে ফেললে, ছায়া আপনার সামনে থাকবে। এরপর আপনি ছায়ার পিছে যতই দৌড়ান, একে আপনি ধরতে পারবেন না। কিন্তু দ্বীনকে যদি সামনে রাখেন, তাহলে ছায়া থাকবে আপনার পেছনে, মানে দুনিয়া থাকবে আপনার পেছনে। কিন্তু এটা আপনার থেকে পৃথক হতে পারবে না। আপনার সাথেই সেঁটে থাকবে। এটা আপনার পেছন পেছন দৌড়াবে। আর এভাবেই আল্লাহকে উদ্দেশ্য বানালে দুনিয়া আপনার পেছনে দৌড়াবে, আপনাকে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে হবে না।

আমাদের উচিত দুনিয়ার এসব বাস্তবতা নিয়ে বেশি বেশি কথা বলা। দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাকে অন্তরে শেকড় গাড়তে না দেওয়া। যখনই কিছু একটা আকর্ষণ করতে শুরু করবে, তখনই তার শেকড় কেটে দেবেন। জিহাদ শেষে সাহাবাগণ গনীমতের মাল সংগ্রহ করতেন। সাহাবাগণ সেই গনিমত সংগ্রহের পর একজন

আরেকজনের সাথে বিনিময় বা বেচাকেনাও করতেন। এমন এক যুদ্ধের পর এক সাহাবি প্রচুর টাকাপয়সা কামাই করলেন। তিনি এসে রাসূল (সা.)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমার চেয়ে সফল কেউ নেই। রাসূল (সা.) টের পেলেন যে ওই সাহাবির দুনিয়াবি সম্পদের প্রতি আকর্ষণ চলে আসছে। তিনি বললেন, না! তোমার চেয়েও সফল মানুষ আছে। সাহাবি বললেন, না, না। আমি উকায বাজারে গিয়েছি। দেখেছি আমার চেয়ে বেশি টাকা কেউ কামায়নি। রাসূল (সা.) বললেন, ফজরের আগের দুই রাকআত সালাত দুনিয়া ও এর ভেতর যা আছে, সে সবকিছু থেকে উত্তম। আজকে আপনি আপনার দামি গাড়িটা কোথাও পার্ক করে রাখলেন। সকালে এসে দেখলেন কেউ গাড়িটার বডিতে একটা আঁচড় দিয়ে গেছে। আপনার মনটা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে! অথচ ফজরের সালাত চলে যাচ্ছে ঘুমের ঘোরে, আমাদের কোনো ভাবলেশ নেই। ফরয তো পরে, যেখানে ফজরের সুন্নাতেরই এত মর্যাদা, সেই ফজর ফেলে আমরা কাকে ধোঁকা দিচ্ছি? এই ফজর মিস গেলে কয়জনের মন কাঁদে? এটাই দুনিয়ার বাস্তবতা। দুনিয়া আমাদের অন্তর থেকে এভাবেই দ্বীনকে নিংড়ে বের করে দিয়েছে।

একদিন তারা একত্রিত হবে

মুসলিমদের আজ এই করুণ দশা কেন, এমন প্রশ্ন যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে কেউ কেউ বলবে, আমাদের ইলমের অভাব! কিন্তু না, আজকের যুগে ইলম অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে সবচেয়ে সহজলভ্য। লক্ষ্য লক্ষ্য কিতাব, মাদ্রাসা, হাফিয, তালিবুল ইলম, আলিম ওলামা—কোনো কিছুর অভাব নেই। মানুষের হাতে হাতে মোবাইলে, ল্যাপটপে ইলম ঘুরছে। আমাদের আজকের এই অবস্থার কারণ, আমাদের মাঝে আজ রিজাল—সত্যিকারের পুরুষরা নেই। উম্মাহর পুরুষরা তাদের 'পৌরুষ' হারিয়ে ফেলেছে। আর উম্মাহ যখন পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে, এতে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয় এর নারী আর শিশুদের। আজকে আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। সারাবিশ্বে তাকিয়ে দেখুন, উম্মাহর নারী আর শিশুরা আজ অসহায়, নির্যাতিত। কারণ পুরুষরা তাদের দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সমাজের মানদণ্ডে 'পুরুষ' হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে,

"while the cat's away, the mice will play"

আজকে এটাই উম্মাহর অবস্থা। পুরুষরা হারিয়ে গেছে, আর কাফিররা এই উম্মাহকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে। ভাগ ভাটোয়ারা করে নিচ্ছে নিজেদের মধ্যে। যার যেখানে খুশি সেখানে জুলুমের বুট ধাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন,

— 'শীঘ্রই মানুষ তোমাদেরকে আক্রমন করার জন্য আহবান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে-অন্যকে আহবান করে'।

সাহাবিরা এটা শুনে ঠিক বুঝে উঠলে পারছিলেন না। কারণ সেসময় মুসলিমরা সংখ্যায় অল্প, তারপরও তাঁরা চারদিক জয় করছে, অমুসলিমরা তাদেরকে সমীহ করছে। তাই সাহাবিরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

— "ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?'"

আমরা কি সংখ্যায় তখন এতটাই নগণ্য হবো যে নিজেদের রক্ষাই করতে পারব না? রাসূল (সা.) বললেন,

—'না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন"

বিস্মিত সাহাবিরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। সমুদ্রের ফেনার মতো মুসলিমদের সংখ্যা, এত অগণিত, অথচ এত করুণ অবস্থা হবে তাদের? তাঁরা জিজ্ঞেস করল, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আমাদের এই করুণ অবস্থা হবে? রাসূল (সা.) জবাব দিলেন,

—আল্লাহ তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহহান ঢুকিয়ে দেবেন'।

'ওয়াহহান' শব্দটা আরবদের কাছে পরিচিত ছিল না। তাই তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করল,

— 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল ওয়াহহন কী?' রাসূল (সা.) বললেন,

—'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং কিতালকে (আল্লাহর পথে যুদ্ধ) অপছন্দ করা'।[৬]

আবু দাউদে সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য একটি সহিহ হাদিসে 'ওয়াহহান' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে— "দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা"[৭]

এই হাদিস আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এতটাই বাস্তব, এতটাই প্রাসঙ্গিক, মনে হয় যেন ১৪০০ বছর আগে নয়, মাত্রই গত সপ্তাহে হাদিসটা নাযিল হয়েছে। সাহাবিরা এই হাদিস শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা তাদের

---

[৬] মুসনাদে আহমদ, খন্ড-১৪, হাদিস-৮৭১৩

[৭] আবু দাউদ: ৪২৯৭ (শাইখ আলবানি সহিহ বলেছেন)

চারপাশের বাস্তবতার সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আজ আমরা এটা শুনে, নিজেদের সাথে মিলিয়ে দেখে, সহজেই বুঝে ফেলতে পারি, ১৪০০ বছর আগে এই হাদিস দিয়ে রাসূল (সা.) কী বুঝিয়েছিলেন।

রাসূল (সা.) দুনিয়ার উপমা দিয়েছিলেন কান কাটা মরা ছাগলের সাথে—যেটা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। উম্মাহর পুরুষরা আজ সেই কান কাটা মরা ছাগলের পেছনে হাঁপানো কুকুরের মতো ছুটছে। ওয়াল্লাহি! ওয়াহহান—দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা—আমাদের 'পৌরুষ' কেড়ে নিয়েছে। এই উম্মাহকে বিকলাঙ্গ করে ছেড়েছে।

দ্যা গ্যাংস্টার

দাওয়াহ জগতে সীমিত সময়ের বিচরণে আমি দুই ধরনের মানুষের মুখোমুখি হয়েছি। এক ধরনের মানুষের ভাবসাব হলো গ্যাংস্টারের মতো। নিজেদের অন্তরে, এমনকি কখনও মুখেও তারা এই বিশ্বাসটা প্রকাশ করে বসে যে, আল্লাহর জন্য তার কোনো সময় নেই। এই দ্বীন, এই ধর্ম, নবির সুন্নাহ, এটা করো ওটা কোরো না, এটা হারাম, সেটা জায়েয নেই—এসবকে তার পাত্তা দেওয়ার টাইম নেই। মনের ভেতর প্রচণ্ড রকম অহংকার নিয়ে এরা জমিনে দাপিয়ে বেড়ায়। তাকে দাওয়াহ দিতে গেলে বলে,

'আরে যান তো! কয়টা দাড়ি গজিয়েছে, ইউটিউবে দুই-চারটা হাদিস শুনেছেন, আর এখন আমার সামনে বকবক করতে এসেছেন! যান, ভাগেন! আপনার এসব হুজুরগিরির আমার দরকার নেই। আমাকে আমার কাজ করতে দিন।'

এমন ভাব করে যেন আল্লাহকে তার দরকার নেই। সে একাই একশো!

আবার আরেক ধরনের মানুষ আছে, যারা হয়তো দুই-এক বছর ধরে দ্বীনের উপর আছে, প্রকাশ্যে না বললেও তাদের অন্তরে এমন একটা বিশ্বাস চলে আসে যে—'আমি খুব বড় কিছু একটা।' সে অন্যদের দিকে নিচু দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করে। সে ভাবে সে অন্যদের চেয়ে একটু উপরে। আমার কী সুন্দর দাড়ি, আর ওই লোক ক্লীন শেইভড। আমি দশ বছর ধরে সালাত কাযা করি না, আর ওই লোক ঠিকমত ওযু করতেই জানে না। নিশ্চয় আমি তার চেয়ে ভালো! আর সে এটাও বিশ্বাস করতে শুরু করে যে—তাকে আল্লাহর খুব দরকার। তার সালাত, সাদাকা, তাসবীহ—এসবের জন্য আল্লাহ যেন অপেক্ষা করে থাকেন! মসজিদে যাওয়ার পথে সে হয়তো কাউকে পঞ্চাশটা টাকা দান করল, তারপর মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করল— আরে! আল্লাহ্ আমার কাছে বিরাট ঋণী হয়ে গেলেন! আমি যেহেতু গত দশ বছর ধরে সালাত পড়ছি, আল্লাহ যেন আমার কাছে বিরাট কৃতজ্ঞ!

এই দুই ধরনের মানুষের জন্যই দুঃসংবাদ। আল্লাহ আপনার কাছে মোটেই ঋণী নন। মোটেই না! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আপনাকে দরকার নেই। আপনার সালাত, আপনার সিয়াম, আপনার সময়, আপনার দাওয়াহ, আপনার দাড়ি—কোনোকিছুর জন্য আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। তিনি আমাদের রব—রাব্বুল আরশিল আযীম। আমার-আপনার বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দরকার। সুতরাং আপনি কাকে ধোঁকা দিচ্ছেন? ধোঁকার মধ্যে বরং আপনি নিজেই। শয়তানকে তাই আপনার মন নিয়ে খেলতে দেবেন না। "মাশাআল্লাহ! তুমি তো দ্বীনের পথে আছ। তুমি অন্যদের চেয়ে অনেক উপরে।"—এই আত্মতুষ্টির ধোঁকায় পড়বেন না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে আপনি কিছুই না, একেবারেই নগণ্য, মূল্যহীন!

আর যে গ্যাংস্টার ভাব নিয়ে আছে আর ভাবছে আল্লাহর জন্য তার সময় নেই, সেও কিছু না, একেবারেই নগণ্য। মানুষ একটা চাদরের ভেতর নিজেকে আড়াল করে রাখে। সেই চাদর সে নয়। আর এর চেয়ে খারাপ হলো এসকল গ্যাংস্টারেরা মুসলিমদেরকে খাটো করে দেখে। সে হয়তো ভালো দেখে একটা গাড়ি কিনেছে, তার চারপাশে হয়তো কিছু চাটুকার ঘোরে—যারা তার শারীরিক আকার দেখে ভয় পায়। তাই সে ভাবে আমি দারুণ কিছু একটা! অথবা হয়তো সে এদিক ওদিক করে দুটা পয়সা কামাই করছে, এতেই সে ভাব ধরছে—আমার কাছে ওসব ধর্মের বাণী নিয়ে আসবেন না। আমি যা ইচ্ছা করব, যেখানে ইচ্ছা যাব, যা খুশি বেচব, যা মনে চায় পান করব, যার সাথে ভালো লাগে শুবো। আপনারা থাকেন আপনাদের ধর্ম নিয়ে। আল্লাহ এত মহান হলে উনি আমার কাছে এত ইবাদাত চায় কেন? আল্লাহর কসম! আপনি যা-ই করেন, যা-ই দেখেন, যা-ই বেচেন, যার সাথেই শোন, এসবে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয় না। সহিহ হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা সকল মানুষ ও জিন যদি একত্র হয়ে আমার ইবাদাত করতে করতে সবচেয়ে নেককার হয়ে যাও, তাতে আমার রাজত্ব থেকে কিছুমাত্র বাড়ে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমরা সকল মানুষ ও জিন একত্র হয়ে অবাধ্যতা করতে করতে সবচেয়ে অবাধ্য ব্যক্তিটির মতোই হয়ে যাও, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না।

আজকাল কোনো মজলিসে এসব দ্বীনের কথা যখন শুনি, আমাদের মনে হয় ইশ! আমার ভাইয়ের আজকে এখানে থাকা উচিৎ ছিল! আহ! আমার বাবা যদি এই খুতবাটা শুনতে পেতেন! তার এটা শোনা খুব দরকার। খালি অন্যের কথা মাথায় আসে, নিজের কথা কেউ ভাবে না। এটা হলো রোগাক্রান্ত অন্তরের বড় একটা

লক্ষণ। কারণ আল্লাহ যদি চাইতেন তারা এটা শুনুক, তিনি তাদের এখানে নিয়ে আসতেন। কিন্তু তিনি আপনাকে এনেছেন, কারণ রোগ আপনার অন্তরে।

আপনি যা-ই করেন না কেন, মদ খান, বেশ্যাবৃত্তি করেন, টাকা মারেন, এতে আল্লাহর এক বিন্দু ক্ষতি নেই। আল্লাহ আল-মালিক। আল্লাহ সার্বভৌম। তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী ফকির। কেউ হামবড়াই করে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে আমার নামাজ-রোজার কোনো দরকার নেই। আরেকদল ভাবে আমি দশ বছর ধরে নামাজ-রোজা করি, আমাকে আল্লাহর বড় দরকার। আপনার ধারণা আল্লাহ আপনার কাছে ঋণী?

রাসূল (সা.) সাহাবাদের নিয়ে বসে আছেন। সেই সাহাবাদের নিয়ে—যারা দুনিয়ার বুকে পদচারণ করা শ্রেষ্ঠতম প্রজন্ম। আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে কুরআনে বলেছেন, আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট। নবিজি (সা.) এক সহিহ হাদিসে সেই সাহাবাদের বলছেন, আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখো না। আমি যা শুনি, তোমরা তা শুনতে পাও না। সাত আসমান চিড়চিড় শব্দ করছে, আর এর শব্দ করাটাই স্বাভাবিক। সাহাবাগণ অবাক হয়ে গেলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর অর্থ কী?

কোনো জিনিস যখন তার উপরে থাকা মালামালের ভার নিতে পারে না, তখন তা চিড়চিড় করতে থাকে।

আজকে তো আমরা বড় বিজ্ঞানী প্রজন্ম হয়ে গেছি। অ্যাস্ট্রোনমির যত কিছু আমরা জানি, তা বাস্তবে থাকা জিনিসগুলোর এক পার্সেন্টও না। আমাদের সৌরজগৎ হলো এমন মিলিয়ন মিলিয়ন সৌরজগতের মধ্যে একটি মাত্র। বিজ্ঞানীরা বলেন এই মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালাক্সির মধ্যে শুধু আমাদের গ্যালাক্সিতেই যত তারকা আছে, প্রতি সেকেন্ডে সেগুলোর একটি করে গুনলে তিনশ ট্রিলিয়ন বছর পরেও সব গোণা শেষ হবে না। আমাদের সূর্য হলো সেই সব নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে ছোটগুলোর একটি, যা আমাদের পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। আর এই সব তারকারাজি আছে শুধু প্রথম আসমানে!

আর রাসূল (সা.) বলছেন, সাত আসমানের মধ্যে চার আঙুল পরিমাণ জায়গা খালি নেই যেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা আল্লাহকে সিজদা করছেন না। আর আপনি ভাবেন আল্লাহ আপনার টাকার মুখাপেক্ষী? আপনার ইবাদাতের তাঁর খুব দরকার? আপনার নামাজ-রোজা-দান-সাদাকা না পেলে আল্লাহর খুব ক্ষতি হয়ে যাবে? আল্লাহ কোনো পরোয়াই করেন না আপনি ইবাদাত করলেন কি না

করলেন! সাত আসমানের মধ্যে চার আঙুল পরিমাণ জায়গা খালি নেই যেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা আল্লাহকে সিজদা করছেন না। ফেরেশতা! তাদের সৃষ্টির সময় থেকে একটাই সিজদা দিয়ে আছেন—বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে। কিন্তু তাঁরাও যখন উঠবেন, বলবেন, হে আল্লাহ্! আমাদের মাফ করে দিন। আপনার যেভাবে ইবাদাত পাওনা, সেভাবে আমরা তা করতে পারিনি। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে সিজদাহয় পড়ে থেকেও, নিষ্পাপ ফেরেশতারা বলছে, তারা আল্লাহর ইবাদাতের হক্ব আদায় করতে পারছে না, আর আমরা ভাবি কি না আল্লাহর আমাদেরকে দরকার?

আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে[৮] বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকে ক্ষুধার্ত, শুধু সে ছাড়া যাকে আমি খাওয়াই। আজ কেউ এক বেলার খাবার কিনে ভাবে, আমি এটা কিনে খাচ্ছি! ভুল! আল্লাহ্ আপনাকে খাওয়াচ্ছেন। মানুষ নিজের খাবারের দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত অহংকারী হয়ে যায়! মনে করে আমার খাবার আছে। কাজেই আমার এটা দরকার নেই, ওটা দরকার নেই। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে না খাওয়ালে আপনার কী সাধ্য আছে খাবার মুখে তোলার?

আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকে উলঙ্গ, শুধু সে ছাড়া যাকে আমি পরাই। আজ একেকজন গুচি ব্র্যান্ডের জুতা কিনে এমন ভাবে উঠে যায় যে আপনি তাদের সালাম দেওয়ার জন্যও নাগাল পাবেন না। এমন অহংকার! সামান্য এক জোড়া জুতা কিনে সে ভাবে আমি কিছু একটা! অন্যের জুতায় একটা দাগ থাকলে তাকে আর পরোয়া করে না। মুসলিমরা আজকাল গাড়ি, ঘড়ি, জুতা দেখে বিচার করে তার অবস্থান সমাজের কোথায়। অথচ আপনারা সবাই উলঙ্গ, যদি না আল্লাহ্ আপনাদের কাপড় পরান।

আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকে পথহারা, শুধু সে ছাড়া যাকে আমি পথ দেখাই। আর আজ ভাইয়েরা “দ্বীনে”র উপর এসে এমন ভাব ধরে, আল্লাহু আকবর! এরা কুফফার, ওরা পথভ্রষ্ট, তারা জাহান্নামী। কে আপনাকে নবি বানিয়ে দিয়ে গেছে? নবিজি (সা.) তো এমন কখনও করেননি।

মানুষ হজ্জে যায়। ফিরে আসার পর তাকে আর মুহাম্মাদ ডাকা যায় না, ডাকতে হয় আলহাজ্জ মুহাম্মাদ। ‘ভাই কিছু মনে করবেন না, আমি হজ্জ করেছি তো, আমাকে আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ডাকুন দয়া করে।’ সত্যিই? তাই? আপনি ভাবছেন হজ্জ করে

[৮] এটি একটি হাদিসে কুদসির কিছু অংশ। হাদিসটি মুসলিম, তিরমিযি ও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত। হাদিসের মান সহিহ

আপনি আল্লাহর চোখে কিছু একটা হয়ে গেছেন? এমনকি মানুষ মাইন্ড করে! বলে, আমি এত লাখ টাকা খরচ করলাম, চারটা সপ্তাহের জন্য পরিবারের সঙ্গকে কুরবানি করলাম! আমাকে আলহাজ্জ ডাকবে না? অথচ রাসূল (সা.) এই হাদিস বলছিলেন সেই সাহাবাগণকে, যারা হাসিমুখে আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দিতেন। আপনার পূর্বসূরি, আপনার আদর্শ। যারা আল্লাহর রাস্তায় কঠিনতম কুরবানিগুলো করতেন, আর ভাবতেন আমি কিছুই করতে পারলাম না। আর আপনি কিছুই করেন না, আর ভাবেন আসমানে চড়ে বসে আছেন।

নবিজি (সা.) এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবাদের বলছেন, তোমাদের কেউ নিজ আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেউ না! তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও না? তিনি বললেন, আমিও না। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠতম মুজাহিদ, শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক, শ্রেষ্ঠতম বাবা, শ্রেষ্ঠতম স্বামী, মানবতার প্রতি সবচেয়ে বড় রহমত, আল্লাহর সবচেয়ে বড় আবিদ, শ্রেষ্ঠতম রাসূল, শ্রেষ্ঠতম নবি, শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলছেন আমিও না, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে ঢেকে দেন।[৯]

আর মানুষ 'মুই কী হনু' ভাব নিয়ে ঘোরে। এমন ভাব ধরে চলে যেন তারা মাশাআল্লাহ এখনি জান্নাতি। অমুক আলিমকে দেখিয়ে বলে, উনি তো একেবারে জান্নাতের উঁচু মাকামের লোক।

নবিজি (সা.) এক ব্যক্তির কথা বললেন যে ৫০০ বছর ধরে আল্লাহর ইবাদাত করেছে। আল্লাহ্ বিচার দিবসে ফেরেশতাদের বললেন, যাও একে আমার রহমতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাও। লোকটির মনে হলো, এ কী? আমি পাঁচশ বছর ধরে ইবাদাত করলাম। আমি মূল্য চুকিয়ে দিলাম। আর এখন কি না আল্লাহর রহমতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে? তিনি বললেন, না, আমাকে আমার আমলের কারণে জান্নাত প্রবেশ করান।

ও আচ্ছা! তুমি তোমার আমলের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? ভালো! আল্লাহ আদেশ দিলেন মীযান নিয়ে আসতে। হুকুম দিলেন এক পাল্লায় তার ৫০০ বছরের আমল রাখতে, আরেক পাল্লায় তাকে আল্লাহর দেওয়া শুধু একটি নিয়ামত রাখতে—দুচোখ দিয়ে দেখার নিয়ামত। ওজন করা হলো। শুধু চোখ দিয়ে দেখতে পারার নিয়ামত তার ৫০০ বছরের আমলের চেয়ে ভারি হয়ে গেল। আল্লাহ হুকুম

[৯] মুসলিম-২৮১৬

দিলেন, যাও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। কেবল তখনই লোকটি বলল, হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমত পেয়ে সন্তুষ্ট।

আজ আপনি ভাবছেন দেখার জন্য দুটি চোখ থাকলেই যথেষ্ট। ভুল! অসংখ্য মানুষের চোখ আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখতে পায় না। আল্লাহই আপনাকে দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন। আজ আপনি ভাবছেন শোনার জন্য দুটি কান থাকলেই যথেষ্ট। ভুল! অসংখ্য মানুষের কান আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে শুনতে পায় না। আল্লাহই আপনাকে শোনার ক্ষমতা দিয়েছেন। আজ আপনি ভাবছেন হাঁটার জন্য দুটি পা থাকলেই যথেষ্ট। ভুল! অসংখ্য মানুষের পা আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে হাঁটতে পায় না। আল্লাহই আপনাকে হাঁটার ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ! আপনি নিজে নন। আপনি ভাবছেন সেই আল্লাহর আপনাকে দরকার? আপনার ইবাদাতের জন্য তিনি মুখাপেক্ষী? না, আল্লাহর আপনাকে দরকার নেই। আমার, আমাদের কাউকে আল্লাহর দরকার নেই। এটা আমাদের আকিদা, এটা জানতেই হবে। যাতে ইবাদাতের সময় আপনি বিনয়ের সাথে দাঁড়াতে পারেন। যাতে জীবনের যেকোনো সময় মাথায় রাখতে পারেন যে আপনি যেখানে আছেন, সেখানে আছেন কেবল আল্লাহর দয়ার কারণে। শুধু তাঁর রহমতের কারণে। ইয়াকীন রাখতে হবে যে আল্লাহ আমাদের রব, আমাদের মালিক, আমাদের ইলাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। কাউকে তাঁর দরকার নেই। বরং আমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। আমাদের সবার তাঁকে দরকার।

ব্যথার কথা

তাবুক যুদ্ধ ছিল মুমিন এবং মুনাফিকদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করার এক উপলক্ষ্য। সেসময় রাসূল (সা.) রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি বারেবারে সবাইকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেবার তাগাদা দিচ্ছিলেন। প্রথমবারের মতো ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) বাহিনী তৈরি করেন। ঘটনাচক্রে রোমানদের সাথে যুদ্ধ হয়নি, তিন সপ্তাহ পর রাসূল (সা.) বাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন। আর এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কুরআনের সূরাহ তাওবা নাযিল হয়। কুরআনের সবচেয়ে কর্কশ ভাষায় আল্লাহ মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। যে কারণে এই সূরার একটি নাম আল ফাজিহা, অর্থাৎ অপমানকারী, লাঞ্ছনাকারী।

সাঈদ ইবনু যুবাইর (রা.) বলেন, আমি আব্বাস (রা.) কে এই সূরাহর বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, এটি ফাজিহা, কারণ এই সূরাহয় বিভিন্ন আয়াতে মুনাফিকদের স্বরুপ উন্মোচন করা হয়েছে। আল্লাহ এই সূরাহয় নবি (সা.) কে আদেশ করছেন,

> "বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।" (সূরাহ তাওবা, ৯: ২৪)

কুরআনের সবচেয়ে কঠিন ভাষায় নাযিলকৃত আয়াতগুলোর মধ্যে এটি একটি। আল্লাহ তাঁর নবিকে বলছেন, তাদেরকে বলুন...! কাদেরকে বলুন? সেসময় আল্লাহর রাসূল (সা.) এর আশেপাশে কারা ছিল? আমি? আপনি? না! সেসময় আল্লাহর রাসূলের আশেপাশে ছিল আবু বকর, উমর, উসমান, আলি—উম্মতের

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। আল্লাহ তাদের সাথে এরকম ভাষায় কথা বলেছেন। আর ভাবলেশহীন, দ্বীনের ব্যাপারে তোড়াই কেয়ার করে চলা এই আমরা যদি সেদিন থাকতাম, তাহলে চিন্তা করুন, আমাদের জন্য এই ভাষা কেমন হতো!

যারা নবির জন্য, দ্বীনের জন্য, সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিল আল্লাহ তাদেরকেও বলেছেন—না, শুধু ভালোবাসা, ইবাদাত বন্দেগী এসবে চলবে না! শধু এতটুকু দিয়েই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যাবে না! নিজেদের পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তান, ধন-সম্পদ, ব্যবসা, বাণিজ্য, সবকিছু থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অধিক প্রিয় না হবে, ততক্ষণ তোমরা ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। আর যদি তোমরা এই পরীক্ষায় ফেল করো, তবে পরিণতি কী? পরিণতি হলো আল্লাহর শাস্তি। সে শাস্তির মধ্য দিয়ে আজকের উম্মাহ প্রতিনিয়ত দিন যাপন করছে।

> একদিন উমর (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার প্রাণ ছাড়া বাকি সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কারো কাছে তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় না হয়েছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারে না।' উমর (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার প্রাণের থেকেও প্রিয়।' তিনি বললেন, 'হে উমর! এখন (তুমি পূর্ণ মুমিন)।' (বুখারি, কসম ও নযর অধ্যায়)

আরেকটি হাদিসে নবিজি (সা.) বলেছেন,

> 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয়তম হয়েছি।' (বুখারি: ঈমান অধ্যায়, মুসলিম: ঈমান অধ্যায়)

সাহাবিরা নিজেদের জানমাল, সহায় সম্পত্তি, প্রিয়জনকে কুরবানি করে সেই ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করেছেন।

ছোট্ট বাশীর (রা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন। তিনি এবং তাঁর বাবা। সাথে আর কিচ্ছু নেই। তাঁরা জানতেন যেখানে যাচ্ছেন সেটা তাদের অচেনা, সেখানে আরাম নেই, টাকাপয়সা নেই। দুইটা বছর যায়নি, জিহাদের ডাক এলো, বাশীরের বাবা জিহাদে চলে গেলেন। ছেলেকে কার কাছে রেখে গেলেন? আল্লাহর কাছে! বাশীর (রা.) এর বয়স কত হবে তখন? দশ কি বারো! তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে আসতে দেখলেন। তাদের মাঝে নিজের পিতাকে খোঁজ

করলেন। নেই, কোথাও নেই! তিনি রাসূল (সা.)-এর ঘোড়ার পাশ দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কোথায়? রাসূল (সা.) দুঃখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি ঘোড়ার আরেক দিক দিয়ে গিয়ে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কোথায়? রাসূল (সা.) ঘোড়া থেকে নেমে এলেন, তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আজ থেকে আমি তোমার পিতা আর আইশা তোমার মা!

সাহাবিদের সময়ে কেউ যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের না হতো, তবে সেটা ছিল অপমানের, লজ্জার। একবার এক জিহাদের সময় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি এসে রাসূল (সা.) এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইল। বৃদ্ধ এবং একইসাথে পঙ্গু। তার সন্তানরা বলল, আপনি বৃদ্ধ আর পঙ্গু, আপনার তো ওজর আছে, আপনি বাড়িতেই থাকেন। নবিজি (সা.) ও তাকে ওজরগ্রস্থ হিসেবে মত দিলেন। বৃদ্ধ বাড়িতে যাওয়ার পর তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, সবাই জিহাদে যাচ্ছে, আর তুমি এখানে কী করছ? বৃদ্ধ বলল, রাসূল (সা.) আমাকে ওজরগ্রস্থ বলেছেন। বৃদ্ধের স্ত্রী এবার ব্যঙ্গ করে বলল, যুদ্ধে যেতে ভয় পাচ্ছ সেটা বল! স্ত্রীর কথা শুনে বৃদ্ধ নিজের বর্ম নিয়ে তৎক্ষণাৎ নবিজি (সা.) এর কাছে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবিজি বললেন, তোমাকে না বললাম, তোমার যাওয়ার দরকার নেই! বৃদ্ধ জবাবে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার এই পঙ্গু পা নিয়েই জান্নাতে হাঁটতে চাই। আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

বৃদ্ধের শক্তিশালী দৃঢ়টা দেখে নবিজি (সা.) তাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দেন। সে জিহাদে যায় এবং শহীদ হয়।

এক মহিলা সাহাবি, যুদ্ধে তার পিতা, ভাই, স্বামী সকলেই শহীদ হয়েছিল। মুসলিমদের বাহিনী যখন ফিরে আসে তাকে একে একে তার পিতা, ভাই আর স্বামীর শহীদ হওয়ার কথা জানানো হয়। তিনি প্রিয়জন হারানোর বেদনায় নীরবে কাঁদলেন, কিছু বললেন না। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামনে নিয়ে প্রচণ্ড এক আবেগ আর ভালোবাসা নিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমার নবি, আমার নবি কেমন কাছে? তিনি ঠিক আছেন তো?'

এরাই সেই মানুষগুলো যারা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যাদের কুরবানির কারণে আজ আমি আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনুসারী হতে পেরেছি। তাই তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওরাদু আন—তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট, আল্লাহও তাদের উপর সন্তুষ্ট।

আর আজ আমি আপনি যে জীবন যাপন করছি, আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে যেভাবে মূল্যায়ন করছি, সেভাবে যদি সাহাবিরাও করত, তবে সেই দ্বীন আমাদের পর্যন্ত কোনোদিনও আসত না। এটাই আমাদের বাস্তবতা। আমাদের দ্বীনের অবস্থা আজ এমনই।

ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

> যখন তোমরা ঈনাহ পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে (কোন জিনিসকে কিছু দিনের জন্য ধারে বিক্রয় করে পুনরায় সেই জিনিসকে কম দামে ক্রয় করে নেওয়ার), গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না। (আহমাদ ২/২৮,৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২নং, বাইহাকি ৫/৩১৬)

এই সেই লাঞ্ছনা আর অপমান, যা আজ আমরা ভোগ করছি প্রতিনিয়ত।

তিনিই আমাদের রব—রাব্বুল আরশীল আযীম

আজ মুসলিমদের মনে কত ভয়! কুফফারদের প্রতি ভয়, পশ্চিমাদের প্রতি ভয়, আইনের ভয়, এটার ভয়, সেটার ভয়। কিন্তু আল্লাহ কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন? আপনাকে এই দৃঢ় ইয়াকীন মনে প্রোথিত করতেই হবে যে, অতীত হওয়া, বর্তমানে জীবিত, ভবিষ্যতে যারা আসবে, এদের মধ্যে কোনো মানুষ, কোনো জিন, কোনো গাছ, কোনো পাথর, কোনো পাহাড়, কোনো বালুকণা, কোনো দেশ, কোনো দেশের সরকার, আর তাদের মিলিটারি, তাদের কোনো ক্ষমতা, কোনো নবি, কোনো ফেরেশতা, জিবরাইল, মিকাঈল, ইসরাফিল, প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ঠ আসমান, সপ্তম আসমান, আরশ, কুরসি, আরশ ধরে রাখা ফেরেশতা—কোনোকিছুই কিছু দেয় না, কিছু নেয় না, কিছু বানায় না, কিছু ধ্বংস করে না, কিছু উপরে তুলতে পারে না, কিছু নিচে নামাতে পারে না, ক্ষতি করতে পারে না, উপকার করতে পারে না—ইল্লাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া।

আল্লাহ আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুম—তিনি চিরঞ্জীব। আপনি বলতে পারেন, আমিও তো জীবিত। কিন্তু আপনার জীবন তাঁর অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই, তিনিই আল্লাহ। আল-মালিক। তিনি রাজা। তিনি বিচার দিবসের মালিক, যেদিন সব শেষ হয়ে যাবে, যেদিন তিনি সকল জীবিত প্রাণীর, সকল মানুষের, সকল জিনের, সকর ফেরেশতার ধ্বংসের হুকুম দেবেন, সেদিন কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকবে না, শুধু আল্লাহ্ ছাড়া! তিনি ঘোষণা দেবেন, আইনাল মুলুক? আইনা আবনাউল মুলুক? কোথায় সেই রাজারা, যারা নিজেদের রাজা ভাবত? কোথায় রাজাদের ছেলেরা? কোথায় স্বৈরাচারীরা? কোথায় সেই গ্যাংস্টাররা? তিনি জিজ্ঞেস করবেন, লিমানুল মুলকুল ইয়াওম? আজ রাজত্ব কার? কেউ সেদিন জবাব দিতে পারবে না। আল্লাহ নিজেই জবাব দেবেন—আজ রাজত্ব এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর।

কোন জিনিসে আপনাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরাল? কিসে আল্লাহকে ভুলিয়ে দিল? আল্লাহ কি একবারও আপনাকে ছেড়ে গেছেন? একবারও? কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, হে মানুষ! কিসে তোমাদেরকে আমার থেকে গাফেল করল? বলছেন, হে আমার বান্দারা! এমন একটি সময় কি ছিল না যখন তোমরা বলার মতো, স্মরণ করার মতো কিছুই ছিলে না? তোমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। এক বিন্দু শুক্রাণু। কাজেই এখন নিজের বাড়ি-গাড়ি দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। আপনার শুরু হয়েছিল নুতফা থেকে। যাদের মনে হয় আল্লাহর তাকে দরকার, তার আল্লাহর জন্য সময় নেই, তারা মনে রাখুক, তারা বীর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আপনি বীর্য ছিলেন। যদি আপনি মেঝেতে পড়ে থাকতেন, কেউ আপনাকে হাত দিয়ে তুলত না। পছন্দ হোক বা না হোক, আপনি এটাই ছিলেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) অসাধারণ একটি কথা বলেছেন—মানুষ দুইবার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়েছে। সেই মানুষের কীসের এত অহংকার?

আল্লাহ মানুষকে মায়ের গর্ভে তিন স্তরের অন্ধকারের ভেতর লালন-পালন করেছেন। আপনার পরিবার তখন কোথায় ছিল? আপনার টাকা, গাড়ি, গার্লফ্রেন্ড, ফেইসবুক কোথায় ছিল? যেইসব জিনিস আজ আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, সেগুলো নয় মাস যাবত আপনার মায়ের গর্ভে কোথায় ছিল? আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কোনো ফ্যাক্টরি ছাড়া, কোনো বিজ্ঞান ছাড়া, কোনো যন্ত্র ছাড়া। কোনো প্রতিষ্ঠান আপনাকে সেখানে সাঁতার কাটতে শিখিয়েছে? আপনি নয় মাস গর্ভে সাঁতার কেটেছেন—আল্লাহ শিখিয়েছেন। নয় মাস পার হওয়ার পর? আল্লাহ্ আপনার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়েছেন। যাতে আপনি এই পৃথিবীতে আসতে পারেন। আমাকে বলুন, কীভাবে এত বড় বাচ্চাটা গর্ভের এতটুকু থলির ভেতরে ছিল? কীভাবেই বা বেরিয়ে আসলো? আপনি খালি গায়ে, খালি পায়ে, খতনা ছাড়া এসেছেন। আপনার হাত ছিল, তা দিয়ে ধরতে জানতেন না। মুখ ছিল, খেতে জানতেন না। পা ছিল, হাঁটতে জানতেন না। কে আপনার দেখাশোনা করেছে তখন? কে প্রতিপালন করেছেন। আল্লাহ আপনার মায়ের বুকে দুধ দিয়েছেন। আজ বিজ্ঞান তার সকল যন্ত্রপাতি আর টাকা পয়সা মিলিয়ে সেই দুধের অর্ধেক মানের গুণাগুণ সম্পন্ন দুধ তৈরি করতে পারল না। আল্লাহ আপনার মায়ের বুকে তা কার জন্য রেখেছেন? টাকা দিয়েছেন? এর জন্য আবেদন করেছেন? গরমকালে তিনি একে ঠান্ডা রেখেছেন, শীতকালে গরম। কে করল? মানুষের মনে আপনার প্রতি এত দয়া কে দিল? আপনি হাঁটতে পারতেন না, আল্লাহ হাঁটার সামর্থ্য দিলেন। আপনি ধরতে পারতেন না, আল্লাহ

ধরার শক্তি দিলেন। আপনি খেতে পারতেন না, আল্লাহ্ আপনার দাঁত গজাতে দিলেন। আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন। আপনার হৃদপিণ্ড প্রতিবার স্পন্দিত হওয়ার আগে আল্লাহর অনুমতি চায়। আল্লাহ একবারও না করেছেন? আপনার প্রতিটা শ্বাস গ্রহণের জন্য আপনার ফুসফুস আল্লাহর অনুমতি চায়। আল্লাহ একবারও না করেছেন? এমনকি যখন আপনি যিনা করেন, যখন মদ খান, যখন হারামে লিপ্ত হন, যখন গুনাহ্ করেন, নফসের উপর জুলুম করেন, তখনও এরা নিজেদের কাজ করার জন্য আল্লাহর অনুমতির মুখাপেক্ষী। তারপরও আল্লাহ আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অনুমতি দেন। এত জুলুম, এত নাফরমানির পরও!

আজ ভাইয়েরা ভাইদের সাথে কথা বলে না, একটা ভুলের কারণে। স্বামী-স্ত্রীতে তালাক হয়ে যায়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের কারণে। আপনি নিজের পায়ে হাঁটতে পারেন বলে, নিজের হাতে ধরতে পারেন বলে, নিজের জন্য একটা পাউরুটি বানাতে পারেন বলে এখন আর আল্লাহর জন্য আপনার সময় নেই? আপনি ব্যস্ত? এটা আমার দরকার নাই? এ-ই কি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার নমুনা? আমি ক্ষুধার্ত, আপনি আমাকে এক প্লেট গরম খাবার দিলেন। এখন আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য কি প্লেটের উপর থুতু মারব? ওয়াল্লাহি! আমরা যদি জানতাম আল্লাহ আমাদের কত ভালোবাসেন, আমাদের কত যত্ন করেন, এটাই কি যথেষ্ট হতো না?

আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের পাপ যদি আসমান সমানও হয়, কিন্তু তোমরা আমার সাথে কাউকে শরীক না করো, অতঃপর আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি সেই পরিমাণ রহমত নিয়েই হাজির হবো। হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা কিছুতেই তোমাদের প্রতিপালকের রহমতের প্রতি নিরাশ হয়ো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা যদি আমাকে অবজ্ঞা করতে, কখনও আমার ইবাদাত না করতে, কখনও আমার হুকুম না মানতে, সবচেয়ে খারাপ মানুষটির মতো হয়ে যেতে, আর জীবনে কেবল একবারই তোমার মনে আমার ভয় প্রকাশ করে আর তুমি বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি বলব, না'আম, ইয়া আবদি? কী লাগবে, হে আমার বান্দা? আপনি বললেন, হে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ আপনাকে ঠিকই মাফ করে দেবেন!

হে আমার বান্দা! তুমি যদি আমার কাছে, অমুখাপেক্ষী আল্লাহর কাছে এক বিঘত অগ্রসর হও, আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। বান্দা যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। হে আমার বান্দারা! তোমরা

যখন আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করি।[১০] তোমরা যখন আমাকে ভুলে যাও, তখনও আমি তোমাদের স্মরণ করি।

আল্লাহর কসম, তিনিই আমাদের রব, আমাদের মালিক—রাব্বুল আরশীল আযীম। কীভাবে আমরা এই মহান রবকে ভুলে থাকি, অকৃতজ্ঞ হই?

[১০] বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি ও ইবনু মাজাহ। সুপরিচিত হাদিসে কুদসি।

চূড়ান্ত লড়াই

আজকালকার যুবকদের কাছে সিনেমায় দেখা জগতটাই আসল জগৎ। এদের জীবনে হালাল-হারাম বলে কিছু নেই। সব হালাল! তারা কোনো একটা হারাম কাজের জায়গায় যাচ্ছে, ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় যাচ্ছ? বলবে, ওই তো! যেখানে সবসময় যাই! কিচ্ছু বলতে পারবেন না তাদেরকে। গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে হলে, বাপের সামনে থেকে সরে যান, ইঁদুরের মতো লুকিয়ে পড়েন। যেন আল্লাহ দেখছেন না! বুড়ো বাপটার থেকে লুকিয়ে গেলাম, আর কোনো সমস্যা নেই। এবার যা খুশি তা করা যায়! তারপর আছে অ্যালকোহল, হারাম উপার্জন। এই সবই যুবসমাজের সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যাগুলো আসে কীভাবে? যুদ্ধ তো আমাদের ও শয়তানের মধ্যে। যারই গার্লফ্রেন্ড আছে, যে-ই মদপান করে, সীসা টানে, হাশিশ টানে, কাউকেই শয়তান এসে বলে না, "তোমার অবশ্যই গার্লফ্রেন্ড থাকা উচিৎ।" কীভাবে আসে সে? কেবল একবার তাকাতে বলে, বিড়িতে কেবল একটা টান দিতে বলে।

আপনাদেরকে বারসিসার কাহিনী বলি। সে ছিল বনি ইসরাইলের বড় আবিদ। তার ধার্মিকতা সর্বজনবিদিত। তার আলাদা ইবাদাতখানা আছে, সেখানে সে রাত দিন আল্লাহ-বিল্লাহ করে। সেসময় তিনজন ভাই জিহাদে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাদের একটি বোন ছিল। তারা বলল, আমরা জিহাদে গেলে আমাদের বোনের দেখাশোনা কে করবে? প্রস্তাব দেওয়া হলো, আরে বারসিসার চেয়ে ভালো আর কে আছে? এতবড় আল্লাহর ওলি। বারসিসাকে গিয়ে তারা বলল তাদের বোনের দেখাশোনা করতে। ভাইয়েরা বলল, হে বারসিসা! আমরা জিহাদে যাচ্ছি। আপনি কি দয়া করে আমাদের বোনের দেখাশোনা করবেন? বারসিসা সাথেসাথে বলল, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। কিছুতেই না! বারসিসার জবাব শুনে ভাইয়েরা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

তারপর বারসিসার কাছে শয়তান এলো। শয়তান বারসিসার কাছে এসে বলল, বারসিসা! ভাই আমার! কী করছ তুমি? এই লোকগুলো জিহাদে যাচ্ছে। ভালো কাজে যাচ্ছে। আল্লাহর রাস্তায় যাচ্ছে। তুমি ওদের বোনের দেখাশোনা না করলে কীভাবে কী? তুমি সবচেয়ে মহান। তুমি সবচেয়ে ধার্মিক। তারা যদি তাদের বোনকে অন্য কারো হিফাজতে রেখে যায়, তাহলে কী হবে? বারসিসা বলল, ঠিকই তো! আমার তো উচিৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওই মেয়ের দেখাশোনা করা। যাতে এ ভাইয়েরা নিশ্চিন্তে জিহাদে যেতে পারে।

দেখেন শয়তানের ওয়াসওয়াসা কীভাবে শুরু হয়। শয়তান যখন আপনার দরজায় কড়া নাড়ে, সে এই আশা করে না যে আপনি তার জন্য দরজা খুলে দেবেন। সে কেবল একটা উঁকি মারতে চায়। দরজা একটু ফাঁক করে বলবেন কে? ব্যস! এতটুকুই চায় সে। একটা ফাটল, একটা ছোট্ট ছিদ্র। তার সময়ের অভাব নেই। মোক্ষম সময়ের সুযোগ নিতে সে দিনের পর দিন মেহনত করে যাবে।

বারসিসা ওই ভাইদের ডেকে বলল, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের বোনের দেখাশোনা করব। কিন্তু সে আমার সাথে থাকবে না। তোমাদের বোন ইবাদাতখানার পেছনের বাড়িটাতে থাকবে। আমি থাকব এখানে। ভাইয়েরা রাজি হলো। বোনকে বারসিসার কাছে রেখে তারা জিহাদে চলে গেল।

দিন যেতে থাকল। বারসিসা খাবার রান্না করে দরজায় রেখে দিত। ওই মেয়ে এসে খাবার নিয়ে যেত। কিন্তু সে ইতোমধ্যে শয়তানের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। কয়দিন ধরে এমনই চলল। তারপর একদিন শয়তান এসে বলল, বারসিসা! তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না তোমার দরজার সামনে খাবার রাখলে তাকে অনেক দূর হেঁটে এসে সেটা নিতে হয়? এটা তো ফিতনা! লোকে তাকে দেখতে পায়। আমার মনে হয় তোমার উচিৎ তার বাড়ির দরজায় গিয়ে খাবার রেখে আসা। যুক্তি আছে কিন্তু! বারসিসা এখন খাবার রান্না করে তার দরজায় রেখে দরজা নক করে চলে আসে। কয়দিন পর শয়তান বলল, তাকে কিন্তু এখনও দরজা খোলা লাগে। খাবারটা তার ঘরের ভেতরে রেখে এসো। এমনটাই কয়দিন ধরে চলল। শয়তান এবার এসে বলল, দেখ বারসিসা! অনেক দিন হয়ে গেছে কিন্তু! এই নারীটির কথা বলার কেউ নেই, সামাজিকতা রক্ষার উপায় নেই। তুমি যদি তার সাথে কথা না বলো, তাহলে আল্লাহ জানে বাইরে গিয়ে সে কোন ফিতনায় পা দেয়। তো বারসিসা তার ঘরে গেল। সে ঘরের বাইরে থেকে তার সাথে কথা বলছে। কিছু সময় পরে শয়তান বলল, বারসিসা! তুমি কেন নিজেকে অপমান করছ? বাইরে থেকে এমন চিল্লাচিল্লি ভালো দেখায়? ভেতরে গিয়ে ওর সাথে কথা বলো! কয়দিন পর বাসার ভেতরে

গিয়ে কথা বলা শুরু হলো। ছোট ছোট আলাপ আস্তে আস্তে বড় হয়। বড় আলাপ থেকে তাকে দেখার ইচ্ছা জাগে। দেখার পর ধরতে মন চায়। তারপর? তারপর মহান বারসিসা সেই মেয়ের সাথে যিনায় লিপ্ত হলো।

যিনার ফলে নারীটি গর্ভবতী হয়ে গেল। একটা ছেলে বাচ্চা জন্ম দিল। এবার শয়তান এসে বলল, মেয়েটির ভাইয়েরা যদি ফিরে এসে এই বাচ্চাকে দেখে, আর তুমি ছিলে এই নারীর দেখাশোনার দায়িত্বে, তুমি তাদের কী জবাব দেবে? বারসিসা চিন্তিত। বলল, এখন আমি কী করব? শয়তান বলল, তোমাকে এই বাচ্চাটাকে হত্যা করতে হবে। বারসিসা তা-ই করল। এখন দুইটা গুনাহ। যিনা ও হত্যা। কয়দিন পর শয়তান আবার এলো। বলল, তোমার কি মনে হয় এই মেয়েটি যা ঘটেছে সবকিছু গোপন রাখবে? ভাইদের বলে দেবে না? বারসিসা বলল, তাহলে এখন উপায়? তাকেও মেরে ফেল! যিনা ও দুই হত্যা।

ভাইয়েরা ফিরে এসে বলল, বারসিসা! আমাদের বোন কোথায়? বারসিসা বলল, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তোমাদের বোন প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাকে নিয়ে গেছেন। বারসিসা বড় আবিদ। কখনও মিথ্যে বলে না। ভাইয়েরা বিশ্বাস না করে যাবে কোথায়? সে তাদের একটা নকল কবর দেখিয়ে দিল। ভাইয়েরা দুআ করে চলে গেল।

পরদিন এক ভাই বলল, গত রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। আরেকজন বলল, আরে আমিও তো! আচ্ছা তুমি কী দেখেছ বলো তো! সে বলল, আমি দেখলাম আমাদের বোন অসুস্থ হয়নি। সে গর্ভবতী হয়েছিল। তারপর তাকে ও তার সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। আরো দেখলাম আমাদেরকে যেখানে তার কবর দেখানো হয়েছিল, সেখানে তাকে কবরস্থ করা হয়নি। অন্য কোথাও করা হয়েছে। অন্য ভাইয়েরা বলল, আরে অদ্ভুত! আমিও এই স্বপ্ন দেখেছি। দুইজন একইসাথে একই স্বপ্ন নিশ্চয় স্বাভাবিক কিছু না। তারা ওই জায়গায় গিয়ে মাটি খুঁড়ে তাদের বোন ও সাথে একটি বাচ্চার লাশ পেল। তারা বারসিসার কাছে ফিরে গিয়ে বলল, বারসিসা! তুমি মিথ্যে বলেছ। এই এই আসল ঘটনা। এখন তোমাকে জেলে দেব।

তো এখন ভাইয়েরা বারসিসাকে শাসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। পথে বারসিসা নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবল আমি কীভাবে এই ফাঁদে পড়লাম। ব্যভিচার, দুইটা হত্যা! এখন আমাকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য নেওয়া হচ্ছে! সে বন্দী হওয়ার পর শয়তান তার কাছে মানুষের রূপে আসলো। বলল, বারসিসা! তুমি জানো আমি কে? সে বলল, না। শয়তান বলল, আমি শয়তান। আমি তোমাকে এই সব বিপদে ফেলেছি।

আর আমিই তোমাকে আবার এখান থেকে উদ্ধার করতে পারব। শয়তান বলল, বারসিসা! তোমার জন্য একটা লাইফলাইন আছে। বারসিসা বলল, আমি সব করতে রাজি। খালি আমাকে এখান থেকে বের করো। শয়তান বলল, আমাকে সিজদা দাও। তাহলে আমি তোমাকে বের করে নেব। বারসিসা সিজদা করল। এরপরেই শয়তান বিদায় নিল। এর কিছু পরেই বারসিসাকে শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হলো। বারসিসার জীবনের শেষ কাজ কী ছিল? শির্ক—সবচেয়ে বড় কুফর—যার পরিণতি জাহান্নাম। সে আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য দরজা খুলেছিল। শয়তান সেই দরজা দিয়ে তাকে সেটা তাকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়ল!

গুনাহর চক্রটা দেখেছেন? আজকে আপনি ভাবছেন, আরে সিগারেটই তো খাচ্ছি—মদ-গাঁজা-ইয়াবা? আস্তাগফিরুল্লাহ! না না ওসব ছুঁয়েও দেখি না। কিন্তু এভাবেই চক্রটা শুরু হয়। আজ হয়তো একটা সিগারেট, এখন হয়তো কেবল তাকান, এখন হয়তো খালি এসএমএস বিনিময়, ফেইসবুক চ্যাট। কাল কী হবে জানেন না। ধরুন আমি-আপনি একই রাস্তায় চলছি। তারপর আমি এক ডিগ্রী বাঁক নিলাম। মানে খুবই অল্প। কিন্তু এই এক ডিগ্রী সরে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর যাওয়ার পর দেখা যাবে আপনার আমার মধ্যে বিশাল দূরত্ব। একটা দৃষ্টি, একটা ম্যাসেজ দিয়েই দরজা খুলে যায়। মাত্র একটা লোন, মনে হয়, ভাই আমি এই একটা লোনই নিচ্ছি। এ ছাড়া আর কোনো সুদের কারবারের সাথে জড়িত নই। আসলে এসব করে আমরা নিজেদের গলা চেপে ধরছি। এভাবে একটা ভুল দিয়েই সবকিছু শুরু হয়।

শয়তান এভাবেই এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট করে একশ পার্সেন্ট নিয়ে যায়। বারসিসা কি কোনো সাধারণ লোক ছিল? সে বিরাট পরহেজগার। কিন্তু সে শয়তানের জন্য একবার দরজা খুলেছিল। খোলেনি, একটু উঁকি দিয়েছিল। আর আজকে আমাদের দরজা, জানালা, ফ্লাডগেইট সব খোলা শয়তানের জন্য।

আমি আপনাকে হালাল-হারাম নিয়ে খবরদারি করছি না। বলছি দরজাটা না খুলতে। আপনি শয়তানের সাথে চালাকিতে পারবেন না। শয়তান আদম (আ.) আগে থেকে আছে। সে আপনার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী। আপনার, আমার ও সকল আলিম, মাওলানা, মুফতি, শাইখের চেয়ে শয়তান ইসলাম সম্পর্কে বেশি জানে। আমাদের সবার জ্ঞান মিলে শয়তানের জ্ঞানের সমান হবে না। শয়তানের সাথে খেলতে যাবেন না, ঝুঁকি নিয়েন না।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতার মৃত্যুর সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার পিতা মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই জ্ঞান হারান, আবার জ্ঞান আসে। যখন জ্ঞান ফেরে তখন বলেন, “না, এখনও না, এখনও না।” তারপর আবার জ্ঞান হারান। আব্দুল্লাহ চিন্তিত হয়ে গেলেন। বাবা কী বোঝাতে চাইছেন? তিনি ভাবলেন, বাবা হয়তো এই দুনিয়া ত্যাগ করতে চাইছেন না। তিনি বলেন, আমি চিন্তিত মনে বাবার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জ্ঞান ফেরার জন্য দুআ করতে লাগলাম। তাঁর জ্ঞান ফিরলে আমি বললাম, কেন আপনি বলছিলেন ‘না, এখনও না, এখনও না’? তিনি বললেন, পুত্র! শয়তান আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে আফসোসে নিজের নখ কামড়াতে কামড়াতে বলছে, আহমাদ! তুমি আমার হাত ফসকে বেরিয়ে গেলে! আহমাদ! তুমি আমার হাত ফসকে বেরিয়ে গেলে! তাই আমি বললাম, না এখনও না। যতক্ষণ না আমি মারা যাচ্ছি, ততক্ষণ তোমার আমার যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না।

আমাদের ও শয়তানের মাঝে এই যুদ্ধ মৃত্যু পর্যন্ত চলবে। আলিমগণ বলেন, মৃত্যুর আগের সময়টাতেই মানুষের উপর শয়তানের আক্রমণ প্রবলতম হয়ে যায়। আমরা অনেকে এমন ভাব ধরে থাকি, আরে আমি তো মুসলিম। ইনশাআল্লাহ আমি পাশ করে যাব। এটা কীভাবে সম্ভব যে ইমাম আহমাদের যে আত্মবিশ্বাস ছিল না, তা আপনি-আমি পেয়ে বসে আছি? শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ এই ঘটনার ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, মৃত্যুর সময় শয়তান মানুষের পেছনে তার সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দেয়।

আপনি মৃত্যুর আগে কুফরি করার আগ পর্যন্ত সে আপনাকে ছেড়ে যাবে না। আর আমরা ভাবছি যে আমরা পাশ করে যাব। আমরা এখন যুবক, শক্তিশালী, সামর্থ্যবান। শয়তান তার সামর্থ্যের একটা অংশ দিয়ে শুধু চেষ্টা করে, আর তাতেই আমরা ফেল করি। একজন নারী পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, আমরা দৃষ্টির হেফাজত করতে পারি না। মিউজিক বাজতে শুরু করে, আমরা সেখান থেকে সরে যেতে পারি না। ফজরের সালাতের আযান দেয়, আমরা ঘুম থেকেই উঠতে পারি না! শয়তান দিচ্ছে তার সামর্থ্যের ৫%, আর তাতেই আমরা প্রতিদিন ফেল করি। সেখানে ভাবছি যে শয়তান যখন ১০০% দেবে, তখন আমরা পাশ করে যাব? কত বোকা আমরা!

জিন্দেগী কা কিমাত ক্যায়া হ্যায়? —লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের আজ যে অবস্থা তা যে কারো জন্যই বেদনাদায়ক, হতাশাব্যঞ্জক। এ যেন ইতিহাসে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থা। চোখের সামনে এতকিছু দেখেও আমাদের হৃদয়ে কোনো দোলা লাগে না। শত শত মানুষের মৃত্যু যেন আজ বড্ড স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এমনকি নিউজে এখন আর এগুলো আসেও না। যদি আসেও, এসব ভয়ঙ্কর নিউজের পরে শেষের দিকে গিয়ে খুব কিউট কিছু নিউজ দেখিয়ে ইতি টানে। যেমন চিড়িয়াখানার কোনো প্রাণী বা খেলার খবর। যাতে আপনি আগে যা দেখেছেন, তা ভুলে যান। আপনার মনে যেন ঐসব ভয়াবহ খবরগুলো স্থান নিতে না পারে।

যুবকদের মাঝে এ নিয়ে অনেক আবেগ দেখা যায়, ইয়া আল্লাহ্! কখন আপনার সাহায্য আসবে? কখন নুসরাহ আসবে? আর কত মানুষের মরতে হবে? কখন ইসলাম আবার মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বিশ্বের দরবারে দাঁড়াবে? এই বিষয়ে কথা উঠলে সবাই আলিম হয়ে যায়। যেন সবারই একটি মত দিতেই হবে। এর পক্ষে আবার সবার হাজার হাজার দলিল। আলিমদের নানারকম মত। খিলাফাহ নেই, দাওয়াহ ঠিকমতো হচ্ছে না, ইত্যাদি। আবার সাধারণ জনগণেরও আলাদা আলাদা মত। আলিমরা ঐক্যবদ্ধ না, আরব নেতারা ঐক্যবদ্ধ না, এই ব্যক্তির এই দোষ, ওই দেশের সেই দোষ।

কিন্তু আমরা সবাই বাস্তবতা এড়িয়ে যেতে চাই। শুনতে খারাপ লাগলেও কঠিন বাস্তবতাটা হলো—উম্মাহর আজকের এই অবস্থা হয়েছে আপনার কারণে। হ্যাঁ, আপনার কারণে। হয়তো ভাবছেন তা কীভাবে? উম্মাহর এই অবস্থা হওয়ার কারণ হলো আমরা অন্য সবকিছুকে আল্লাহর আগে স্থান দিয়েছি। আমাদের কাজগুলোর দিকে তাকান। আমাদের যুবকরা আজকে বস্তুবাদী এই দুনিয়ার মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে গেছে। আপনি ভাবছেন ভালোমতো পড়াশোনা করব, ভালো চাকরি করব, অনেক

টাকা বানাব, বাড়ি বানাব, হজ্জ করব, আমার স্ত্রী খুব সুন্দর সুন্দর বোরকা পরবে, আমার বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে কুরআন শিখবে, আর হঠাৎ করেই আমরা হয়ে যাব আদর্শ মুসলিম। এমন মানুষদেরই সিরিয়া-ফিলিস্তিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখলে বলে, ভাই দেখেন! আমি আমার দায়িত্ব পুরা করছি।

কিন্তু না, এভাবে কোনো পরিবর্তন আসবে না। আপনারও না, এই উম্মাহরও না। আপনাদের বুঝতে হবে যে, উম্মাহর সংশোধনের দায়িত্ব আমাদের উপর। আমাদের পিতার উপর না, অমুক আলিমের উপর না, অমুক দেশের নেতার উপরও না। এটা আপনার আমার দায়িত্ব। পৃথিবীতে যা হচ্ছে, তা আপনার আমার কৃতকর্মের একেবারে সরাসরি ফলাফল। আমাদের কৃতকর্মের কারণেই আল্লাহর সাহায্য আসছে না। আমাদের প্রত্যেকে যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বানাচ্ছে, ততদিন আল্লাহর সাহায্য আমরা আশা করতে পারি না। আমরা দুনিয়ার জন্য যেভাবে কষ্ট করি, আখিরাতের জন্য সেভাবে কষ্ট করা শুরু করতে হবে। দুনিয়ার জন্য আপনি যত চেষ্টা-মেহনত করেন, দ্বীনের জন্য তার দশ পার্সেন্ট দিয়ে দেখুন উম্মাহর অবস্থা কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। সাহাবিরা আমাদের পূর্বপুরুষ। পৃথিবী আজকে তাঁদের ব্যাপারে জানে না, এটা রীতিমতো আমাদের অপরাধ। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চিনি না। সাহাবিদের আল্লাহ কেন সাহায্য করেছিলেন? কেন দুনিয়া তাদের পায়ের নিচে এসে লুটিয়ে পড়েছিল? কারণ তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সবকিছু দিয়েছিলেন। এটাই তাঁদের সাথে আমাদের পার্থক্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ আসলে কোনোকিছুই তাঁদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না।

বদরের যুদ্ধের সময় আবু বকর (রা.) ছিলেন মুসলিম বাহিনীতে, আর তাঁর ছেলে ছিলেন অমুসলিম, মুশরিকদের বাহিনীতে। পরে তাঁর ছেলেও অবশ্য মুসলিম হন। একদিন দুজন একসাথে বসে আছেন। এমন সময় তাঁর ছেলে বললেন, আপনার বদরের যুদ্ধের কথা মনে আছে?

— হ্যাঁ, অবশ্যই।

—সেদিন আমি আপনাকে বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম। কিন্তু ইচ্ছা করেই আপনাকে হত্যা না করে সরে এসেছি। কারণ আপনি আমার পিতা।

আবু বকর (রা.) বললেন,

—আল্লাহর কসম! আমি যদি তোমাকে দেখতে পেতাম, তাহলে আমার তরবারি দিয়ে তোমাকে হত্যা করতাম।

সাহাবাদের পথে কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াত না। এই অনুভূতি আজ মুসলিমদের অন্তর থেকে মরে গেছে। দ্বীনের জায়গা দুনিয়া এসে দখলে নিয়ে নিয়েছে।

ভাই, আমি ব্যস্ত। আরে কীসের ব্যস্ত? এই বৌ-বাচ্চা, চাকরি-ব্যবসা। চাইলেও দ্বীনের জন্য সময় দিতে পারি না। কিন্তু কিছু একটা হলেই আলিমদের দোষ, তাদের কারণেই আজকে আমাদের এই অবস্থা! আচ্ছা আলিমরা যদি কিছু না করে ভুল করেই থাকেন, তাহলে আপনি করেন! আমি? না, মানে, ইয়ে...! দোষ সবাই সবার ধরতে পারি, কিন্তু প্রচলিত নিয়ম ভাঙার কথা উঠলে আমরা ভয় পেয়ে যাই।

বদর যুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। বেশ কয়েকজন বন্দী পাওয়া গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাবছেন এদের নিয়ে কী করা যায়। তিনি সাহাবাদের মতামত জানতে চাইলেন। আবু বকর (রা.) মত দিলেন, দেখুন, ইসলাম এখনও মানুষের কাছে নতুন। আমাদের সেনাবাহিনী দুর্বল। আমরা এই বন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেই। তার উপর তারা আমাদের আত্মীয়-স্বজন। তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে মুক্তিপণের টাকা দিয়ে আমরা ইসলামকে শক্তিশালী করি, আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করি। উমর (রা.) বললেন, না, আমি কঠিনভাবে দ্বিমত করছি। আপনি আলির আত্মীয়কে আলির হাতে দিন, আমার আত্মীয়কে আমার হাতে দিন। প্রতিটি মুসলিমের হাতে তার কাফির আত্মীয়কে দিন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাফির আত্মীয়দের হত্যা করুক। যাতে কুফফারদের কাছে, মুসলিমদের কাছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি যে আমাদের ও ইসলামের মাঝে কোনোকিছুই এসে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিচ্ছু না! আলি (রা.) বললেন, না, না। এভাবে না। বড় একটা গর্ত করে তাদের সেখানে ফেলে দিন।

এরাই সেসকল মানুষ, যারা পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তাঁদের অন্তরে দ্বীনের পথে বাধা হওয়া কোনো জিনিসের জন্য চুল পরিমাণ জায়গা ছিল না। সব কুরবানি করে দিতে রাজি। আজ আমরা যে পরিমাণ আরামে ইসলাম পালন করি, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দ্বীন আমাদের কাছে মুফতে আসেনি। এটি সাহাবাদের রক্তের দামে এসেছে। আর আমাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা কত অসার! মানুষ তাদের জীবন কুরবান করে দিয়েছে। এটাই আমাদের সুন্নাহ, এটাই আমাদের ঐতিহ্য, এটাই মুসলিমদের আকিদা। পরিবর্তন আসবে না, যদি না আমরা সেই জীবন ফিরিয়ে আনতে পারি। পরিবর্তন আসবে না, যদি আমরা ভরাপেটে ঘুমোতে যাই। পরিবর্তন আসবে না, যতদিন আমরা দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা রাখছি।

রাসূল (সা.) একদিন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা একটি পঁচা খেজুর তুলে নিলেন। তিনি সেটার পঁচা অংশগুলো ছাড়ালেন। তারপর আব্দুল্লাহকে বললেন, তুমি একটু খাবে? এটা আব্দুল্লাহর চোখের সামনে পঁচা অবস্থায় পড়ে ছিল। এমন না যে রাসূল (সা.) পকেট থেকে বের করে সেটা দেখাচ্ছেন। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, না। এটা তো পঁচে গেছে। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি এটা পঁচা বলে খাচ্ছো না। আর আজকে চারদিন হয়ে গেল তোমার নবির পেটে কোনো খাবার পড়েনি।

আজকে আমরা সবাই পরিবর্তনের কথা বলি। কিন্তু কীভাবে? আমরা চিন্তা করি আমাদের জীবনটা খুব সুন্দরভাবে চলবে, বউ-বাচ্চা-পরিবার নিয়ে নিরাপদে আর সুখে শান্তিতে থাকব, সেইসাথে ইসলামও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে, বিশ্ব জয় করে ফেলবে, মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে এসে যাবে। এসব তো মুভিতে হয়। আপনি তো রূপকথায় বাস করছেন না।

সাহাবাদের জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাঁরা থাকতেন পৃথিবীর সেরা দুটি জায়গায়—মক্কা ও মদিনায়। বিদায় হজ্জের সময় সেখানে থাকা এক লাখ সাহাবার মধ্য থেকে মাত্র দশ হাজার জনের কবর সে অঞ্চলে পাওয়া যায়। বাকি সব কোথায় গেলেন? কোথায়? ফিশিং ট্রিপে? হানিমুনে? তাঁরা সারা দুনিয়ায় ইসলাম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর সময় কোনো বই রেখে যাননি। কোনো কারুকার্য সমেত অট্টালিকা রেখে যাননি, যেখানে আমরা অবসর সময়ে ঘুরতে যেতে পারি। তিনি এই উম্মাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ কিছু পুরুষ রেখে গিয়েছিলেন। আল্লাহ কুরআনে পুরুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন, যাদেরকে কোনোকিছুই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে পারে না এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা থেকে বাধা দিতে পারে না—তারা হচ্ছেন পুরুষ। আল্লাহ এসব পুরুষদের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহ আপনার টাকার দিকে তাকিয়ে নেই—এসব তো তাঁরই টাকা। তিনি চান পুরুষরা উঠে দাঁড়াক। আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা আছে যে আমরা পাঁচটা ফরয ইবাদাত করলেই সবকিছু ঠিক আছে। না! পাঁচটি খুঁটিই পুরো বিল্ডিং নয়। এগুলো কেবল পিলার। আল্লাহ সেসব পুরুষের অপেক্ষায় আছেন যারা এই ভিত্তির উপর ইসলামের দালান তৈরি করবে।

সাহাবাগণ শহীদ হয়েছিলেন। নারীরা বিধবা, শিশুরা ইয়াতীম হয়েছিলেন। রাসূল (সা.)-কে এসব দৃশ্য দিনের পর দিন দেখতে হয়েছে। কিন্তু তিনি এসব সহ্য করে গেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে পৃথিবীর কোণায় কোণায় দ্বীন পৌঁছানোর জন্য

এটাই আল্লাহর রীতি। সাহাবাগণ যদি দ্বীনকে এভাবে বুঝে থাকেন, তাহলে আমরা অন্যভাবে বুঝি কেন? আমরা বলি, ভাই, দেখেন, আমি তো নামাজ-রোজা করিই, যাকাত দিই, কঠোর পরিশ্রম করি। এগুলোকেই সাহাবাগণ দ্বীন মনে করলে তাঁরা কখনও মক্কা-মদিনার সীমানা ছেড়ে বের হতেন না। ইসলামও এর বাইরে ছড়াত না। তখন আমরা কেবল কিছু মূর্তপূজারীর সন্তান হতাম। কিন্তু তাঁদের কুরবানির কারণে আজকে আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে পারি। এটা এমনে এমনে আসেনি। রাসূল (সা.)- উহুদের যুদ্ধে নিজের চাচাকে শহীদ হতে দেখেছেন। শুধু শহীদ না, তাঁকে চিড়ে ফেলা হয়েছিল। যেই মহিলা তাঁকে হত্যা করিয়েছিল, সে তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিবিয়েছে। এত রাগ ছিল তাঁর উপর। রাসূল (সা.) সেই দৃশ্য দেখে এত কষ্ট পেয়েছিলেন যে, এক বর্ণনায় আছে তিনি সত্তরবার তাঁর জানাযা পড়েছেন। যখন আল্লাহর কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে নিশ্চয় হামযা হলেন আল্লাহর সিংহ ও রাসূলের সিংহ, তখনই কেবল তিনি শান্ত হলেন।

সাহাবাগণের কেউ যদি আজকে আমাদের ইসলামের অবস্থা দেখতেন তাহলে আফসোস করে বলতেন, আমি কি এগুলো দেখার জন্য প্রাণ দিলাম? আজ যদি বলা হয় কে কে জান্নাতে যেতে চান হাত তুলুন। কারো হাত তোলা বাকি থাকবে না। যদি বলা হয় কে কে মরতে চান? সব হাত নেমে যাবে। অথচ না মরলে আপনি জান্নাতে যাবেন কী করে? পরিবর্তনের কথা ভাবলে আমরা ভাবি বেঁচে থেকেই জান্নাতে যাওয়ার কথা। আমরা দুনিয়াতেও থাকতে চাই, আবার জান্নাতেও থাকতে চাই।

এর মানে এই না যে সবাই মিলে যুদ্ধ বাঁধাতে হবে। কিন্তু বাস্তবতাটা বোঝার চেষ্টা করুন। মানুষ খুশি খুশি মুখে এসে আমাকে বলে, ভাই, এই বছর দশ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই? আর আপনি খুব খুশি? আর হাজারে হাজারে যে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে, সেটার কী হবে? দ্বীনের বিজয় বলতে আপনি কী বোঝেন? ইউটিউবে বসে ইসলামি ভিডিও ক্লিপ দেখতে পারা? রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে অল্পকিছু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তারা বলল, আমরা তো রাসূল (সা.)-এর হাতে যাকাত দিতাম। এখন সেখানে আবু বকর। নাহ! এর কাছে আমরা যাকাত দেব না। আবু বকর (রা.) সাহাবাদের জড়ো করলেন। সাহাবারা বললেন, দেখেন আবু বকর, ইসলাম এখনও দুর্বল, রাসূল (সা.) আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এখন আমরা বিশ্রাম নিয়ে শক্তি সঞ্চার করি। আবু বকর (রা.) তখন ফুঁসছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে দেখে তিনি

আশ্বস্ত হলেন। যাক, অবশেষে একজন মানুষ পাওয়া গেল যে কাজের কথা বলতে জানে। উমর, তোমার কী মত? উমর (রা.) বললেন, দেখেন, আমাদের এখন দুর্বল অবস্থা। এখন খুব স্পর্শকাতর সময়। আমরা আপাতত শক্তি সঞ্চয় করি। তারপর না হয় আমরা তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করব। আবু বকর (রা.) খুব হতাশ হলেন। তিনি উমরকে শক্ত করে ধরলেন, দেখো অন্যদের কথা বুঝলাম। কিন্তু তুমি জাহিলি যুগে জাব্বার ছিলে, কঠোর ছিলে। আর এখন ইসলামে এসে তুমি ভেড়া হয়ে গেলে? তুমি, উমর? আমি আবু বকর বেঁচে থাকতে আল্লাহর দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে? তিনি বললেন, আমি তাদের শেষ লোকটা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকব।

বাদ দেন সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ঘরের বাইরে গিয়ে দেখুন যুবকদের কী অবস্থা। আমরা মদ, গাঁজা, ইয়াবার কাছে আমাদের হাজার হাজার মুসলিম ভাইকে হারাচ্ছি। আমাদের বোনদেরকে হারাচ্ছি। আপনি কোনো পার্লার ওয়ালাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন। প্রতিদিন সকাল থেকে শত শত মুসলিম নারী যায়। নিজেদের শরীরে ট্যাটু করায়। বয়ফ্রেন্ডের নাম লিখিয়ে আনে। অথচ আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, আমি বেঁচে থাকতে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে? এসব এই সমাজের বাস্তবতা। কে এসব পাল্টাবে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) যতদিন আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় না হচ্ছেন, ততদিন বিজয় আসবে না।

এক সাহাবি (রা.) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে ভালোবাসি। রাসূল (সা) বললেন, বুঝেশুনে বলছ তো? সাহাবি বললেন, আল্লাহর কসম আমি আপনাকে ভালোবাসি। রাসূল (সা.) বললেন, ভালো। তাহলে শোনো। আমাকে যে ভালোবাসবে, তার কাছে বন্যার চেয়েও দ্রুতবেগে দারিদ্র্য আসবে।

সুতরাং *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* কোনো সহজ বিষয় নয়। এর মূল্য চুকাতে হয়। আর এর বিনিময় হলো জান্নাত। জান্নাতু আদনিন তাজরিমিন তাহতিহাল আনহার— চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত।

একদিন ঠিক বেচে দেব

দিনগুলো বড্ড বদলে গেছে
আসমানের রঙের মতো
মোবাইলের ইনকামিং কলগুলোও।
খেয়াল করে দেখলাম পেশাগত কারণ,
নয়তো নিজের প্রয়োজন
এছাড়া কেউ আর খবর নেয় না।

অথচ এই কয়দিন আগেও
আমাদের আলোচনাজুড়ে থাকত
জান্নাত, আখিরাত, দ্বীন
আল্লাহর পথে যাত্রা, কিংবা বিপ্লবের শিহরণ!

সেই অনেক দিন হয়ে গেল
কাউকে দেখে জান্নাতের কথা মনে পড়ে না।
কারো সাথে কিছু সময় কাটিয়ে
খুউউব ভালো হয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা হয়না অনেকদিন।
টাকা, ব্যবসা, সামাজিকতা, স্ট্যাটাস
আমাদের আত্মাগুলো চুষে খেয়ে নিয়েছে
মুখের সেই নিষ্পাপ অভিব্যক্তিগুলো পর্যন্ত
বিবর্ণ, ফ্যাঁকাসে খুব...

আমার তো ইচ্ছে হয়
ঝুম বৃষ্টিতে সবার সাথে ফুটবল খেলি
বাসার বেলকনিতে চায়ের আড্ডাটা আবারও হোক
খোলা মাঠে শুয়ে তারা গুণি
মোড়ের ঐ টং দোকানে
আসরের পর এক কাপ চা!

আমার আম্মা বলে, আমাকে ঢাকা নিয়ে যাবি কবে?
আমি মুচকি হেসে বলি, সেখানে মানুষ থাকে না মা!
আমি বরং তোমাকে নিয়ে একদিন সবুজ ঘাসে হাঁটব
মা আমার অবাক হয়ে তাকায়...

একদিন আমি ঠিক দেখিয়ে দেব
সুটেড বুটেড সাহেব বাবু না হয়েও দিব্যি বেঁচে থাকা যায়
একদিন আমি ঠিক দেখিয়ে দেব
বকরির দুধ আর খেজুরের ঐ জীবনটাতেই সুখ।

যে জীবন তোমাদের সুন্দর হৃদয়গুলো
বিবর্ণ করে ছেড়েছে
সেই জীবনটা...
পুকুর ঘাটে পা ভিজিয়ে বসে
নীল আকাশ দেখার স্বাধীনতার কাছে
একদিন ঠিক বেচে দেব...

মূল লেখা: আদিল উমর
কবিতা: সাজিদ ইসলাম

আহারে আহারে...

একটা মায়ার বাঁধনে
আটকা পড়েছিলাম একদা
দুনিয়া নামের লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে
একগাদা মানুষের ভিড়ে
ব্যস্ততা, দায়িত্ব আর সামাজিকতার পোশাকে।
বিদায় বেলায় কেঁদেছিলে প্রিয়,
তুমি, তোমরা, অনেকেই
কিন্তু যেই না ছোট্ট মাটির কুটিরে ঢুকে গেলাম
তোমাদের জীবনগুলো তো থেমে থাকেনি
থেকেছে কি?

আমার প্লেটে এখনো কেউ চেটেপুটে ভাত খেয়ে উঠে
চায়ের কাপটাতে রোজ চুমুক দেয় কেউ না কেউ
আমার ঐ আরামের তোশকে পিঠ রেখে ঘুমোয় অন্যরা
ক্লাসের ঐ পেছনের বেঞ্চটা তো ফাঁকা নেই
প্রিয়তমার আঙুলে ঠিকই আংটি পরিয়েছে অন্য কেউ।
আমি তিলে তিলে গড়া জীবনটা দিয়ে এলাম
কত আশা, মায়া আর দরদ খরচ করেছি,
অকাতরে, অপাত্রে।

ভুল করেছি
আজ অন্ধকার ঘরের জন্য যদি একটা মোমবাতি খরিদ করে রাখতাম
যদি এই সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে
একটা জানালার বন্দোবস্ত করে যেতে পারতাম,
যদি কিছু মায়া, দয়া, ভালোবাসা এমন পাত্রে রেখে যেতাম
যারা আমার এই দম বন্ধ হয়ে আসা ঘরে কিছু সামান পাঠাত
আমার হয়ে রবের বিচারালয়ে ওকালতি করত
জান্নাতে যাওয়ার আগে আমার আস্তিন ধরে রাখত সজোরে
আহারে আহারে আহারে...

সাজিদ ইসলাম
৩ মার্চ, ২০১৯

গতকাল এই পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ মারা গেছে। পৃথিবীর কোনো কিছুই থেমে থাকেনি। কারো জীবন এতে থমকে যায়নি। একদিন আপনিও মারা যাবেন, পৃথিবীর কিচ্ছু আসে যাবে না। আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাও, কষ্ট পাবে হয়তো, কিন্তু ঠিকই জীবনটা গুছিয়ে নেবে, এগিয়ে যাবে। অথচ এই পৃথিবী ঘিরে আমাদের কত স্বপ্ন, কত পরিকল্পনা আর পাওয়া না পাওয়ার হিসেব! একদিন মৃত্যু এসে মনে করিয়ে দেবে এই পৃথিবী আসলে আমাদের নয়। আমাদের গন্তব্যস্থল আর চূড়ান্ত আবাস অন্য কোথাও। দিনশেষে শুধু পৃথিবীতে থেকে যাবে আমাদের ফেলে যাওয়া কিছু কর্ম, হঠাৎ হঠাৎ প্রিয়জনদের মজলিসে দু'লাইন আবেগঘন স্মৃতিচারণ, কিংবা কবরের পাশে একটি ধুলোমাখা 'এপিটাফ'।